সেবাব্রতী

ভগিনী নিবেদিতা

মহামায়া দেবী

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, [illegible] রো, কলিকাতা — ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

চতুর্থ মুদ্রণ :
আষাঢ়, ১৩৫৯

প্রচ্ছদ—প্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

॥ ভূমিকা ॥

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতার জীবন যেমন ভাব গম্ভীর, তেমনিই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর অসামান্য জীবন-কাহিনী আমাদের কাছে নতুন আলোকের প্রেরণা দেয়।

এই গ্রন্থখানি লিখতে গিয়ে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ভাষায় 'নিবেদিতা'র যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে নিবেদিতার 'The master as I saw him' গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহামায়া দেবী

॥ এক ॥

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতার নাম চিরসত্য হয়ে রয়েছে আমাদের কাছে।

ভগিনী নিবেদিতাকে উদ্দেশ করে জননী সারদা বলেছিলেন :

—পশ্চিম থেকে এ ফুল এনেছে নরেন ঠাকুরের কাছে নৈবেদ্য দেবে বলে। নিবেদিতা একটি আশ্চর্য নাম।

ফিরে তাকাই অতীতের ঘটনার দিকে।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগলীলায় এগিয়ে গেলেন বেদান্তের বাণীকে সফল করে তুলতে সুদূর প্রাচ্য দেশে। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণীতে জেগে উঠেছিল আমেরিকা আর ইউরোপের সমস্ত শহর ও গ্রাম। আর সেই ধ্বনি লণ্ডনের একটি বিদুষী নারী মার্গারেটের কাছেও গিয়ে পৌঁছেছিল।

বিদেশিনী মার্গারেটের সেদিন হল নব জন্ম। তিনিই নিবেদিতা, যাঁর পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল নিজেকে নিবেদন করলেন স্বামীজির পাদপদ্মে।

গুরু স্বামীজি আর তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন উপমা নেই।

আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই একটি নিবেদিতা, আর একজন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। একই সমুদ্রের তরঙ্গ এসে মিশে গেছে একটা জীবন শিখায়।

ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, "তিনি সারা ভারতের পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার ধারাতে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।"

মার্গারেট নোবল একটি বিদেশী নাম হলেও তিনি নিবেদিতা। ভারতের আকাশে-বাতাসে তাঁর পবিত্র স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

তিনি এদেশে এসেছিলেন ভারতের সেবার জন্য। নিবেদিতা প্রেরণা দিয়েছিলেন ভারতের বিপ্লবী, মনিষী, শিল্পী, কবি বৈজ্ঞানিকদের। নবজাগরণের বিরাট বিপ্লব সাধনায় নিবেদিতা তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্পচর্চার মাধ্যমে নিবেদিতা ভারতের বুকে জাগিয়ে ছিলেন আশার আলো।

স্বামীজির ধ্যানের ভারতকে এক নতুন রূপে গড়ে তুলেছিলেন নিবেদিতা।

স্বামীজি বলতেন : বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশে নিবেদিতার জীবন।

বীরসাধক বিবেকানন্দের তিরোধানের পর, গুরুর অসমাপ্ত কাজের মাধ্যমে নিবেদিতা নিজেকে কঠোর ভাবে উৎসর্গ করেছেন। বা পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

ইংলণ্ডের বুক থেকে ভেসে আসা মার্গারেট বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন যা তাঁর কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠেছিল।

নিবেদিতা বলতেন : ভারতের মাটি আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ।

অন্তর আলোকিত করে ভেসে উঠেছিলেন বিদেশিনী মার্গারেট যার রূপে, তিনি হলেন নিবেদিতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে স্মরণ করে বলেছিলেন : "তিনি ছিলেন লোকমাতা। মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করতে পারে তাঁহার মূর্তি তো ইহার পূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য-বোধ আছে, তাহার কিছু আভাস পাইয়াছি। কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ব-বোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'আওয়ার পিপল', তাহার মধ্যে এমন যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত, আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমন তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন, তাহা যে দেখিয়াছে,

সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়ত সাহস দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন সত্য করিয়া, নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে মহিয়সী নারী নিবেদিতার বিস্ময়কর কর্ম-প্রবাহের কথা বেজে উঠেছিল; তাই নিবেদিতার সঙ্গে কবির ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের সাধনার যে সকল দিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, তারই সত্য রূপটি নিবেদিতার কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের নর-নারীদের দেখে নিজেকে অসহায় মনে করে লোকমাতা নিবেদিতা আলোর শিখা জ্বালিয়ে ছিলেন ভারতের বুকে। স্বামী বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণ রূপে জানতে হলে নিবেদিতাকে চিনতে হবে আমাদের। নিবেদিতার বিস্ময়কর জীবনের ঘটনা নিয়ে এ গ্রন্থের সুচনা।

ডান্‌গানন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের একটি শহর। আশ্চর্য এই শহর। প্রকৃতি তাকে সাজিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে। নামেই শহর কিন্তু পরিবেশ ছিল একটা গ্রামের ছবির মতই।

কলকারখানা, যান্ত্রিক সভ্যতা, আলো আর আনন্দ থেকে দূরে সরে ছিল ডান্‌গানন শহর। এখানে বাস করতেন স্যামুয়েল আর মেরী নোবল। সুখের সংসার। এঁদের কন্যা হলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। যিনি পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা রূপে সারা পৃথিবীর কাছে বিস্ময়ের কারণ ঘটিয়েছিলেন। স্যামুয়েল ছিলেন ব্যবসাদার মানুষ। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। যদিও স্যামুয়েল ব্যবসা করতেন তবুও তার মন ছিল অন্যরূপে গড়া। তাঁর মনে ও বুকে বেজে উঠতো বিপ্লবের গান। এ বিপ্লবের গান তাঁর বুকে বেজে উঠতো, এটা তাঁর বংশগত অধিকার।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন মনে করি—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের

গৃহ-যুদ্ধের সময় জন নোবেলের নাম বিস্ময়ের কারণ ঘটেছিল। জন নোবল ছিলেন ওয়েসলিয়ান চার্চের ধর্মযাজক। পর পর তিন বছর তিনি এক চার্চের মধ্যে কার্যে নিবদ্ধ থাকতেন। আবার সেখান থেকে বদলি হয়ে চলে যেতেন অন্য এক জায়গায়। ধর্ম আর রাজনীতি এই দুটোকে জীবনের ব্রত বলে মেনে নিলেন জন নোবল। ওয়েসলিয়ান চার্চের ধর্মযাজক নোবল হলেন আইরিশ বিদ্রোহের নেতা। ঘটনার ছায়া মেললে দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পট-ভূমিকায় জন নোবল নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু কি তাই? তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলও ছিলেন বিপ্লবের প্রেরণা-দাত্রী। জীবন ও সংগ্রামের পটভূমিকায় জন নোবল এগিয়ে গেলেন, আর তাঁদের চতুর্থ সন্তান হলেন স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল। পিতা জন নোবলের সুযোগ্য সন্তান এই স্যামুয়েল। স্ত্রী মেরী ইসাবেলা।

স্বর্গের মত পবিত্রময় একটি দিনে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হলেন স্যামুয়েল আর ইসাবেলার প্রথম সন্তান। সেদিন পৃথিবী কান পেতে শুনেছিল নবজাতকের কান্না, যে কান্নায় মুখর হল মেঘ, মাটি, আকাশ। লাবণ্যময়ীর নীল চোখের তারায় পুলকিত হয়ে উঠলেন স্যামুয়েল আর মেরী।

কী দেবেন নাম? কী নামে হবে তাঁর যোগ্য অভিনন্দন? শরতের সোনালী প্রসন্ন প্রভাতে এলেন এক অনিন্দ্যাসুন্দরী।

ঠাকুরমার নামে নাম মিলিয়ে নামকরণ হল—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। আর মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল হলেন বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী লোকমাতা নিবেদিতা।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান মেরী। মনে মনে ভাবেন—কে এই শিশু!

মনে পড়ে, মার্গারেট পৃথিবীতে আসার আগে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন মেরী: যে শিশু আসছে সে হবে জগত-কল্যাণে নিবেদিত।

মনে পড়ে, মায়ের বুকে মার্গারেট যেদিন এলেন, তাঁর মা অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন : যদি নিরাপদে সন্তানের জন্ম হয় তা হলে তোমার চরণেই তাকে নিবেদন ক'রব।

শিশু বড় হতে থাকে। আনন্দময় হয়ে ওঠে ঘর। একবছর যখন বয়স মার্গারেটের স্যামুয়েল তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। ঠিক করলেন মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন তার ঠাকুরমার কাছে। এখান থেকে চলে যাওয়ার পেছনে সত্য ইতিহাস হচ্ছে স্যামুয়েলের জীবনে সত্যের সন্ধানকে খুঁজে নেওয়া।

স্যামুয়েল ঠিক করেছিলেন একাই যাবেন, কিন্তু তাঁর সাধ্বী স্ত্রী মেরী কিছুতেই রাজী হননি তাঁকে একা ছেড়ে দিতে। অগত্যা স্যামুয়েল তাঁব পত্নীকে নিয়ে ইংলণ্ডের পথে পা দিলেন। যাবার সময় তাঁদের একমাত্র মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরমার কাছে।

স্যামুয়েল এলেন ম্যাঞ্চেস্টারে।

কাজ পেলেন গীর্জায়। পিতার মত, তিনিও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-প্রেমের সংগীত গাইলেন। পিতা জন নোবলের মতই সব। স্যামুয়েল আর মেরী দু'জনেই এসেছেন ইংলণ্ডে·····তাঁদের চোখে ভাসে একমাত্র কন্যা মার্গারেটকে।

তাঁদের একমাত্র সন্তান মার্গারেট পরম আনন্দে তাঁর ঠাকুরমার কাছে একটু একটু করে বড় হতে লাগলেন। দিন কাটছে ছায়াছবির মত। খেলাঘরের খেলায় আসর সাজিয়েছে মার্গারেট ফুল আর প্রজাপতির পিছনে ছুটে। ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনে। বাইবেলের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে ওঠে শিশু মার্গারেট। তাঁর মন কল্পলোকে উধাও হয়ে যায়·····সারল্যে চিরচঞ্চলা মার্গারেট ঘুরে বেড়াতেন আপন মনে। নীল আকাশে হালকা মেঘমালায় তাকিয়ে দেখতেন প্রকৃতির অপরূপ রহস্য······।

ঠাকুরমা ছাড়া আর কিছুই জানত না মার্গারেট। ঠাকুরমার প্রভাবে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ ভাবে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী জীবনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন নিবেদিতা : ঠাকুরমার প্রভাব ও

তাঁর আদর্শ,—আমার শিক্ষা, আমার জীবনকে সুন্দরভাবে চালিত করেছে।

তাই তাঁর জীবনে দেখা গেছে, ঠাকুরমার স্নেহ আর ব্যক্তিত্বে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরমার কাছেই তাঁর প্রথম লেখা-পড়ার হাতে খড়ি……ধর্ম, শিক্ষা, সব কিছুই। ঠাকুরমার প্রিয় গ্রন্থ বাইবেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল শিশু বয়স থেকেই……। বাইবেলের সঙ্গে চমৎকার গান গাইতেন মার্গারেট। এমনি ভাবে জীবনের চার বছর কেটে যায় মার্গারেটের।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলেন স্যামুয়েল আর মেরী। সঙ্গে এসেছে তাদের ছোট্ট একটি তিন বছরের মেয়ে। বাবা-মা এসেছেন মার্গারেটকে নিয়ে যেতে। বাবা তখন ওল্ড হ্যাম চার্চের ধর্মযাজক।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মার্গারেট, দেখলেন, বাবা আর মাকে। আর মেরী দেখলেন তার কন্যা মার্গারেটকে। মনে হল যেন স্বর্গের দেবী।

আনন্দে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেরী। আর মার্গারেট? তিনিও যেন নতুন করে দেখলেন তাঁর মাকে। যেন এই প্রথম দেখা।

আনন্দে আর বেদনায় মার্গারেট চলে এলেন ওল্ডহ্যামের বাড়িতে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে।

আর ঠাকুরমা?

তিনি রইলেন ডানুগানান শহরে—তাঁর নিজের বাড়িতেই।

ইংলণ্ডে এসেছেন মার্গারেট—আয়র্ল্যাণ্ড থেকে ঠাকুরমার কথা সব সময় মনে হয়। আর নীরবে চোখের জল ফেলেন মার্গারেট…। নতুন পরিবেশ, নতুন সবকিছু। বাবা, মা, ছোট্ট বোন মে… লোকজন এখানে। মার্গারেটের কিন্তু এসব ভাল লাগে না। তার মনে ভেসে উঠত ঠাকুরমার স্মৃতি, তাঁর কাছে শোনা বাইবেলের গল্প। মনে পড়ত…সেই দুরন্ত দুপুরে চঞ্চল প্রজাপতির সঙ্গে দৌড়ে যাওয়া। মনে পড়ত ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়ানো। এমনি করে

দিন যায়। এখানে এসে প্রথমটা অসুবিধা হলেও মানিয়ে নিয়েছিলেন মার্গারেট।

এমনি করে দিন কেটে যায়।

ছোট্ট বোনের সঙ্গে তার খুব ভাব। স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে বোনের সঙ্গে খেলা করা, এক বিছানায় শোয়া ; তিন বছরের ছোট্ট বোন হল খেলার সাথী। মার্গারেট নোবল সাত বছরে পা দিলেন। সেই সময় খবর এলো ঠাকুরমার শেষ সময় উপস্থিত।

স্যামুয়েল ফিরে এলেন গভীর বেদনা নিয়ে। ঠাকুরমার মৃত্যুর খবর পেয়ে সাত বছরের মার্গারেট অনুভব করলেন এক আশ্চর্য অনুভূতি। ঠাকুরমার স্মৃতি তাঁর চোখে ভাসতে থাকে। ঠাকুরমা চলে গেলেও, তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল মার্গারেটের অন্তরে। ওল্ডহ্যাম শহর ছেড়ে স্যামুয়েল আবার পাড়ি জমালেন আর এক জায়গায়। শহরের কোলাহল তাঁর কাছে অসহ্য। তা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমেও শরীরটা ভয়ানক ভেঙে যাচ্ছে। নানা কারণে স্যামুয়েল ঠিক করলেন, এই শহর ছেড়ে চলে যাবেন কোন এক গ্রাম্য শহরে।

এলেন যথা সময়ে ডেভনসায়ারের টরেণ্টন গ্রামে। এখানে এসে নিজেকে খুঁজে পেলেন মার্গারেট। ফিরে পেলেন প্রকৃতির সব কিছু। গাছপালার সেই সুন্দর পরিবেশ·· সব কিছু যেন চির-চেনা। মনে হলো হারিয়ে যাওয়া কথা আর স্মৃতি—ঠাকুরমার কথা। মার্গারেট এখানে এসে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। এখানে এসে স্যামুয়েলের কাজ যেন আরও বেড়ে গেল। দেশের কল্যাণ কামনায় তাঁর কাজের মধ্যে সংগ্রাম করে চললেন।

তিনি শুধু ধর্মযাজক নন, একজন মুক্তিকামী সৈনিকও বটে।

এমনি করে ছায়াছবির মত দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে মার্গারেট দশবছরে পা দিলেন। বাবা, মা, আর বোন এই নিয়েই তাঁর জীবন গড়ে ওঠে। আশ্চর্য হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন মার্গারেট।

দেখেন দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। আর তাঁর এই কাজের

সঙ্গী মার্গারেট। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘিরে থাকেন মার্গারেট। বাবার লেখা শুনে মুগ্ধ মার্গারেট। বাবার বক্তৃতা শুনতে শুনতে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন মার্গারেট। মনের রঙিন কল্পনায় সেই শিশু বয়স থেকেই মার্গারেট বানাতেন নানা রকমের গল্প……শিশু বয়স থেকেই তাঁর পিতার কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

স্যামুয়েলের সঙ্গে একদিন দেখা করতে এলেন এক ধর্মযাজক…। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। ভারতবর্ষের কথা বলতে বলতে হঠাৎ ধর্মযাজকের নজরে এলো মার্গারেট। দেখলেন একমনে ভাবমগ্ন অবস্থায় মার্গারেট তন্ময় হয়ে শুনছেন ধর্মযাজকের কথা। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠলেন ধর্মযাজক। সস্নেহে মার্গারেটকে তিনি বললেন, 'একদিন ভারতবর্ষ আমাকে ডেকে নিয়েছিল তার কাজে… হয়তো তোমাকেও একদিন ডেকে নিয়ে যাবে।'

'ভারতবর্ষ' নাম শুনে বিস্মিত মার্গারেট। ভারতবর্ষ কতদূর?

সেদিন থেকেই তাঁর চোখে ভারতের মানচিত্রের রঙ আর ছবি এক হয়ে উঠলো। মনে মনে চেনার প্রার্থনা; 'হয়ত একদিন আমাকেও যেতে হবে!'

এগিয়ে চলে দিন। বড় হতে লাগলেন মার্গারেট। কালের ডাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন পিতা স্যামুয়েল। মরবার আগে স্যামুয়েল বলে গেলেন তাঁর স্ত্রী মেরীকে।—

'দেখ, মার্গারেট এসেছে এই পৃথিবীতে, এসেছে অনেক কিছু কাজ করতে। একদিন সত্যি সত্যি ওর জীবনে আসবে বড় কাজ… বৃহত্তর ডাক। সেদিন তুমি ওকে বাধা দিও না।'

মহাকালের ডাকে চলে গেলেন স্যামুয়েল। পিতাকে হারিয়ে চারিদিক অন্ধকার দেখলেন মার্গারেট। আর সেই অন্ধকার থেকে আলোকে, অসত্য থেকে সত্যের পথে এগোতে শুরু করলেন মার্গারেট।

পিতার আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেন মার্গারেট। অভিভাবক হ'লেন দাদু হ্যামিলটন। দাদু হ্যামিলটনের নির্দেশ পেয়ে মার্গারেট আর তার বোন মে হ্যালিভ্যাক্সের বোডিং স্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলে এসে মার্গারেট শিখলেন নিয়ম আর শৃঙ্খলা। স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে দিন চলে তাঁর। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে মার্গারেটের মন ছুটে যেতো আকাশের দিকে। দেখতেন, আকাশে ছুটে চলেছে পাখীরা। খুশী হাওয়ায় মেতে উঠেছে সব। দূরের আকাশ···কাছের পাহাড় স্কুলের জীবনে এক অজানা রহস্যের হাতছানি দিয়ে ডাকতো। স্কুলের ছুটির পর নীল উঁচু-নীচু পাহাড় মার্গারেটকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো।

স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিস ল্যারেট।

নিয়ম আর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই মিস ল্যারেট তাঁর বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রীকে গড়ে তুলবেন এই ছিল স্বপ্ন ও সাধনা। মার্গারেট শ্রদ্ধা করতেন মিস ল্যারেটকে। স্বার্থত্যাগ আর সংযম এ'দুটি জিনিস তিনি এখানে এসে শিখে নিলেন। ল্যারেট ছিলেন তাঁর চোখে আদর্শ স্বরূপ। যদিও ছাত্রী জীবনে মার্গারেট এর হাতে অনেক শাস্তি পেয়েছেন, তবুও তাঁর প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা কোন দিনই হারিয়ে যায়নি।

মিস ল্যারেট স্কুল ছেড়ে গেলেন, তার বদলে এলেন এক নতুন প্রধান শিক্ষয়িত্রী। নাম তার মিস কলিন্স। মার্গারেট এই নতুন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে পেয়ে- যেন নতুন জগতের সন্ধান পেলেন····। বিচিত্র আর আশ্চর্য মহিলা ছিলেন মিস্ কলিন্স। স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি মিশে যেতেন। বিজ্ঞান পড়তে পড়তে মার্গারেটের চোখে ও মুখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠত। এক অনির্বাণ শিখায় মার্গারেটের মনে প্রশ্ন জাগত, পৃথিবীর সব কিছুরই পরিবর্তন আছে, কিন্তু মানুষের মৃত্যুর কি কোন রূপান্তর আছে ?

ব্যথা-বেদনার বিচিত্র মিছিলে মিস্ কলিন্স বুঝলেন মার্গারেটের মানসিক বিক্ষোভ। মার্গারেটের অন্তরে স্থান পেলেন মিস্ কলিন্স।

মিস্ কলিন্স বন্ধুর মত মিশে গেলেন মার্গাটের সঙ্গে। যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে, নানা আদর্শের মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন মার্গারেটকে। মার্গারেটকে ছবি আর গানের মধ্যে মিস্ কলিন্স যেন দেখলেন আদর্শব্রতী মার্গারেটকে।

আলো আর অন্ধকার থেকে বিকশিত হয়ে মার্গারেট জীবনে পেলেন আলোর সন্ধান।

মিস্ কলিন্সের শিক্ষায় এক অমৃতময় পথের সন্ধান গেলেন মার্গারেট। স্কুলের ছুটির অবসরে বাড়ীতে ফিরে আসতেন মার্গারেট তাঁর বোনকে নিয়ে। আসতেন দাদু হ্যামিলটনের কাছে…।

মা তখন লণ্ডনে একটি কাজ নিয়েছেন। দাদু হ্যামিলটনের উৎসাহ আর প্রেরণাতেই মানবপ্রীতি আর সেবার ধর্ম বুঝলেন মার্গারেট।

দাদুর কাছ থেকে চলে আসার পর আবার ফিরে এলেন স্কুলের জীবনে।

দেখতে দেখতে শেষ পরীক্ষার দিন এলো। মার্গারেট সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

সামনে তার প্রশ্ন। কি করবেন ?

শেষ পর্যন্ত শিক্ষয়িত্রীর জীবনই বেছে নিলেন এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল। কেসউইকের বোর্ডিং স্কুলের চাকরি নিলেন মার্গারেট। দু'বছর এখানে কাজ করার পর তিনি রাগবির অনাথ-আশ্রমে কাজ নিলেন। এখানে এক বিচিত্র স্বাদ পেলেন। সেবার মধ্যে দিয়ে বুঝলেন নিজেকে, অনুভব করলেন অন্তর দিয়ে আশ্রয়হীন অনাথ আতুরের দুঃখ, অভাব, ব্যথা, বেদনা।

এখানে কিছুদিন কাজ করার পর নিবেদিতা আবার ফিরে গেলেন স্কুলের কাজে। এবার নিজেকে যোগ্য মনে করলেন মার্গারেট। রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে মার্গারেট এলেন। এখন তাঁর বয়স একুশ। এখানে এসে খুশীর আবেগে ঝিলমিলিয়ে উঠলেন। খনি-অঞ্চলের এই স্কুলে শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর দিন কাটে না, সেবার কাজ করে চলেছেন অবিরাম গতিতে। নাম লেখালেন 'সেন্ট

মার্কস চার্চে।' ঘুরে ঘুরে মিশে গেলেন সকলের সঙ্গে। এখানে আর্তের উপকার আর সেবা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলেন মার্গারেট।

এখানে এসে বিরাট কর্মসাগরে ডুবে গেলেন মার্গারেট। অসহায়, দীন দরিদ্রের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন তাদের নিয়েই তাঁর সাহিত্য-সাধনা। যাদের কথা কেউ ভাবে না, সেই মূঢ় ম্লানমুখে দিলেন আশার আলো। মার্গারেটের বুদ্ধি-দীপ্ত লেখনিতে চমকে উঠলো সমাজ···দেশের সংবাদপত্র-পত্রিকায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

মার্গারেটের কলম দিয়ে বের হল সমাজের কথা, দেশের অভাব-অভিযোগ। পরিচয়ের সূত্র ধরে এগিয়ে এলেন মার্গারেটের জীবনে ওয়েলসবাসী একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। সময়ের দ্রুততালে মার্গারেটের অন্তরে বন্ধুটি স্থান পায়। কিন্তু পরিচয় আরও নিবিড় না হতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তরুণ বন্ধুটির মৃত্যু হয়। মার্গারেট বন্ধুর এই মৃত্যুতে মুষড়ে পড়লেন। এখানে থাকা তাঁর আর সম্ভব হল না।

শূন্য মন আর স্মৃতি নিয়ে মার্গারেট রেক্সহাম থেকে চলে এলেন চেষ্টারে। কর্মস্থল চেষ্টার। নিজের কর্ম-সাগরে আপন সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

মার্গারেটের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলেন দু'জন মহাপ্রাণ শিক্ষাবিদ। শিক্ষার জগতে আঠারো শতকে তাঁরা জ্বালিয়েছেন নতুন আলো। একজনের নাম যোহান হাইনরিস পেস্তোলোৎসি, আর একজন ফ্রিডরিখ ফ্রয়বেল।

এখানে উল্লেখ করা-প্রয়োজন—পেস্তোলোৎসি সুইজারল্যাণ্ডের লোক। তিনিই প্রথম দেখালেন শিশুদের মনের প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার করলে শিশুদের শিক্ষা সুন্দর হতে পারে।

আর একজন মনীষী ছিলেন ফ্রয়বেল। ইনি জার্মানির লোক। তিনি ছিলেন কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষার চিন্তাধারার নায়ক। এদের দু'জনের আদর্শ মার্গারেটের চোখে আশার আলো জাগালো।

মার্গারেট বুঝলেন—শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন পর তার পথ তিনি

খুঁজে পেয়েছেন। অনুসন্ধানের ফলে মার্গারেট পেলেন নতুন পথ, নতুন চিন্তাধারা। মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর বোন মে ও এই পথ বেছে নিলেন।

লজম্যান ও মিসেস জি. লিউ-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন মার্গারেট। আর এখান থেকেই খোঁজ পেলেন 'গুড সানডে ক্লাবের।' এখানে বৈঠক বসত। নানা রকমের আলোচনা হত। সাহিত্যচর্চা… সামাজিক সমস্যার নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন মার্গারেট। এর পরে কিছু লেখা শুরু করলেন। ছদ্মনামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। এখানে এসে কর্ম-প্রবাহের মধ্যে ডুবে গেলেন মার্গারেট।

মিসেস জি. লিউ-এর আমন্ত্রণে যোগ দিলেন উইম্বলডনের ছোট একটি স্কুলে। এখানে এসে মার্গারেট তাঁর চিন্তাধারাকে সহজ করে নিতে চাইলেন। ঠিক এমনি সময় প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে পরিচয় হল মার্গারেটের। মার্গারেট খুঁজে গেলেন আরেক জগত।

বিপ্লবী বীর প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন ছিলেন বিপ্লবী দলের নেতা। নিজের দেশ থেকে আজ তিনি নির্বাসিত। প্রিন্স পিটারকে বিপ্লবী গুরু বলে মেনে নিলেন মার্গারেট। জাতীয় বিপ্লবের চেতনায় মার্গারেট এগোতে লাগলেন। মার্গারেট দেখলেন পিটার ক্রপটকিনকে। এঁর মধ্যে খুঁজে পেলেন হারানো পিতাকে। মার্গারেটের চোখে তখন নতুন কর্মপ্রেরণা! আশা আর আনন্দ নিয়ে পিটারকে বিপ্লবী গুরু আদর্শ ভেবে মার্গারেট এগিয়ে চললেন।

মার্গারেট নিজেই একটা স্কুল খুললেন নতুন চিন্তাধারা নিয়ে। 'রস্কিন স্কুল'। এই স্কুলে পড়তে আসে শিশুরা। শিশুদের কীভাবে পড়াতে হবে তারই প্রস্তুতি নিয়ে গড়ে উঠবে এই সার্থক কাজ। অফুরন্ত প্রেরণা নিয়ে মার্গারেট তাঁর বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। অল্পকালের মধ্যেই এ বিদ্যালয়ের নাম ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে।

মার্গারেটকে চিত্রবিদ্যা শেখাতেন এবেনজার কুক। এরই সাহায্যে মার্গারেট বিদ্যালয়কে আশ্চর্যভাবে গড়ে তুললেন।

লেডি রিপনের বড়ীতে যে বৈঠক বসতো তার নাম 'সিসেম ক্লাব'। মার্গারেট এখানে নিয়মিত আসতেন। লেডি রিপনের ওখানে সেন্ট্ জেম্স গেজেটের সম্পাদক আর ম্যাকলনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে মার্গারেটের। সাহিত্য আর শিল্প নিয়ে যে আলোচনা হত মার্গারেট ছিলেন তার মধ্যমণি।

মার্গারেটের কর্মপ্রেরণায় 'সিসেম ক্লাবে' আসতেন অনেক জ্ঞানী ও গুণীর দল। আসতেন পত্রিকার সম্পাদকরা। আসতেন সাহিত্যিক ও সমালোচকের দল। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ ছাড়াও আসতেন মনীষী টমাস হাক্সলি প্রভৃতি গুণীজনেরা।

দিন এগিয়ে চলে।

নিজের স্কুল, লেখা, সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে বিরাট কর্মসাগরে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন মার্গারেট।

মার্গারেটকে চিত্রবিদ্যা শেখাতেন এবেনজার কুক। একদিন কুক বললেন, এক ভারতীয় হিন্দু-সন্ন্যাসী এসেছেন। লেডি ইসাবেল মার্গাসনের বাড়িতে আসবেন এই সন্ন্যাসী। তিনি কিছু বলবেন। আমাদের কয়েকজনকে যেতে বলেছেন লেডি মার্গাসন।

হিন্দু সন্ন্যাসী! ভারতবর্ষ! মার্গারেট জবাব দিলেন না। মৌনতায় প্রতিশ্রুতি দিলেন,—যাব।

কুক বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আসছ।

মন্ত্রমুগ্ধের মত চমকে উঠলেন মার্গারেট। তার মনে হলো হারিয়ে যাওয়া শৈশবকালের স্মৃতি। মনে পড়ে পিতার কাছে এসেছিলেন এক ধর্মযাজক। সেদিন বলেছিলেন, যাবে তুমি ভারতবর্ষে? কে জানে কোন গভীর রহস্যতায় জেগে উঠলেন মার্গারেট? যাবেন তিনি—দেখবেন হিন্দু সন্ন্যাসীকে। মার্গারেট যাবেন বলে মন ঠিক করলেন।

॥ দুই ॥

বীরেশ্বর বিবেকানন্দের খবর পেলেন মার্গারেট কুয়াশাভরা শীতের এক সকালে। পরম বিস্ময়ভরা চোখে সংবাদপত্রের মাধ্যমে মার্গারেট দেখলেন, এক হিন্দু সন্ন্যাসী সারা বিশ্ব ঘুরে এসেছেন লণ্ডনে।

স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনে পরম বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে মার্গারেট পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলেন—স্বামীজির বক্তৃতা ইংলণ্ডে বুকে সারা জাগিয়েছে! অজানা অচেনা এই হিন্দু-সন্ন্যাসীকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন মার্গারেট। মনে পড়ে, বীর বিবেকানন্দ জয়মাল্য নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন সারা পৃথিবীর বুকে··। তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বেদ-বেদান্তের বাণী। আর সেই বাণী শুনে সারা পৃথিবী ধন্য হয়ে গেল।

মনে আসছে সেই সোনার অক্ষরে লিখিত ইতিহাসের ঘটনার চিত্র। বিবেকানন্দ এলেন ইংলণ্ডে। কয়েক বছর আগেও তিনি ছিলেন একজন অপরিচিত লোক।

চিকাগো শহরে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন স্বামীজি। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো নব জীবনের বেদমন্ত্র ··।

সেদিন স্বামীজি ছিলেন পরিচয়হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র।

কিন্তু আজ তিনি সারা জগতের কাছে নব-জীবনের বিদ্যুৎপ্রবাহ এনেছেন। বীর সাধক বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এলেন ইংলণ্ডে।

মার্গারেটের এক বান্ধবী খবর দিলেন যে মিষ্টার স্টার্ডির বাড়িতে এই হিন্দু সন্ন্যাসী আসবেন। আর পিকডালী প্রিন্সেস হলে বক্তৃতা দেবেন। মার্গারেট আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রিন্সেস্ হলে গেলেন। মনে পড়ে, তরুণ মনের অশান্ত বেদনায় বীর সাধক চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধি। তার বিনিময়ে কী পেলেন তিনি?

ঠাকুর তাকে দিয়েছিলেন জগত কল্যাণের মহান ব্রত। তিনি ঘুরে বেড়ালেন আসমুদ্র হিমাচল।

আপন মহিমায় নিঃসম্বল অবস্থায় চিকাগো শহরে এসে যোগ দিয়েছিলেন ধর্মমহাসভায়। সেই আয়নায় একই প্রতিচ্ছবি। নিজেকে চেনার, ভারতের মঙ্গলের জন্য মার্গারেট এগিয়ে এলেন এক মনে জনমানবের কল্যাণ কামনায়।

স্মরণ করি, বীর বিবেকানন্দের সেই তেজদীপ্ত বাণী। বীর বিবেকানন্দ বার বার বলেছিলেন ; আধ্যাত্মিককা, পবিত্রতা এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নয়। বিশেষ ধর্ম-সাধনায় মহান চরিত্রের নরনারীরা আবির্ভূত হয়েছেন। তাই প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে—যুদ্ধ নয়—শান্তি। ধ্বংস নয়—আত্মস্থ করে নেওয়া। ভেদ নয়, দ্বন্দ্ব নয়,—চাই শান্তি।

বীর বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জাগরণের অভয় বাণী।

লণ্ডনের প্রিন্সেস্ হলের সভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজি বলেছিলেন : "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগত একটি আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে অগ্নি উদ্‌গীরণ হয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতকে ধ্বংস করতে পারে। এখন যদি তোমরা সাবধান না হও, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য! তোমাদের কলকব্জা আর ছাপাখানায় যা না হয়েছে, যীশু ও বুদ্ধের কয়েকটি কথায় মানব সমাজ তার চেয়ে ঢের বেশী উপকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর ক্ষুৎপিপাসা আর নিদারুণ অভিলাষ।"

স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময় বাণীতে সভা মধ্যে যখন বিপুল উদ্দীপনা দেখা গেল, তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে মার্গারেট নোবল বলেছিলেন : "স্বামীজি, আপনি আমাদের সভ্যতার নির্লজ্জ অনুদারতা, যুদ্ধলিপ্সা, আর অর্থের লোভ লালসাই দেখলেন। ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করে পাশ্চাত্ত্যের আর কিছুই কি আপনার চোখে পড়ল না?"

বীর বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "পড়েছে বৈকি। ভারতবর্ষ চিরকালই মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে জেনেছে। এ-পৃথিবীতে পাপ বলে

কিছু নেই। মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ। আমাদের ভারতীয় জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, তা হচ্ছে সমগ্র জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে একাগ্রীভূত করা। আর যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগতকে প্লাবিত করা।"

মার্গারেট সেদিন বলেছিলেন, 'এই সমষ্টিভূত শক্তির উৎস কি একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই আছে?'

বীর বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতীয় বেদান্ত বার বার করে আত্মজয়ের কথাই বলেছে। বলেছে, আত্মানং বিদ্ধি।'

স্বামীজির কাছ থেকে মহান সত্যের বাণী শুনে সেদিন মার্গারেট অভিভূতকণ্ঠে বলেছিলেন,—পেয়েছি, সে ডাক আমি শুনতে পেয়েছি। এতদিন এরই জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। এই মহান সত্যের বাণী আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি স্বামীজি। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। আপনি আমার গুরু—আর ভারতবর্ষই আমার দেশ।

সেদিনের মার্গারেট পরবর্তী জীবনে হলেন—নিবেদিতা।

স্বামীজি বলতেন: বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশ নিবেদিতার মধ্যে দেখা যায়।

ফিরে আসি আগের ঘটনায়।

প্রিন্সেস্ হলেন ভিড়ের এক কোণে, অগণিত জনতার ভিতর দিয়েই মার্গারেট দেখলেন বিবেকানন্দকে।

দেখলেন এক আশ্চর্য সৌম্যশান্ত পুরুষকে। যাঁর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে অনির্বচনীয় স্বর্গীয় সুষমা। সুগঠিত দেহ, সারা অঙ্গে গৈরিক বসন। মাথায় গেরুয়া রঙের উষ্ণীষ। চিরশক্তিমান পুরুষ বীর বিবেকানন্দ।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বীরেন্দ্র ভাষণ। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো মার্গারেটের। ফিরে এলেন অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

একই আয়নায় সেই প্রতিচ্ছবি।

'সত্যের পথ ধরে আমাকে যেতে হবে।' মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তির আলো নিয়ে স্বামীজির দর্শন পেলেন মার্গারেট। মার্গারেট খুঁজে পেলেন পথের ঠিকানা।

নভেম্বরের শীতের একটি সন্ধ্যা। বাইরে তখন হিমপ্রবাহের মিছিল। লেডি মার্গাসনের বসবার ড্রয়িংরুমে সবাই ব্যস্ত ও অধীর। নীরব জন পনের লোক।

মার্গারেট এলেন, এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মৌনতায় মুগ্ধ সকলে। ধূপের সৌরভ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্গারেটের সামনে সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ। চোখে মুখে আশ্চর্য গভীরতা। হিমালয়ের মত ধ্যান গম্ভীর সে মূর্তি।

মার্গারেট স্বামীজিকে দেখলেন বার বার। শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, ভাবে, আবেগে মোহিত হয়ে গেলেন তিনি। মোহিত হলেন সমবেত সবাই।

সহাস্য বীরসাধক বিবেকানন্দ।

পিছনে রয়েছে জ্বলন্ত চুল্লী। তখন শীতকাল। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে আছে।

গৃহকর্মী লেডি ইসাবেল বললেন, সবাই এসে গেছেন স্বামীজি।

স্বামীজি হাসলেন। গভীর আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে মার্গারেট অপেক্ষা করছেন আসন্ন মধুর সময়টিকে পাবার জন্য। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

নীরব, নিথর।

স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হল: 'শিব, শিব, নমঃ শিবায়।'

তাঁর দৃপ্ত বলিষ্ঠভঙ্গিমায় সবাই চমকে উঠলো। বিদ্যুতের মত তাঁর বাণী।

স্বামীজি বললেন: জীবনের পরম সত্য মানুষের সেবা আর কাজ।

মার্গারেটের অন্তরে আলোর বন্যা। সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিতে মুগ্ধ

হলেন মার্গারেট। তাঁর হৃদয়ে একটি নাম মুখর হয়ে উঠল—স্বামী বিবেকানন্দ। নভেম্বর মাসের কোন এক রবিবারের এক হিমসন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন মার্গারেট। এবং সেদিন থেকেই মার্গারেটের অন্তরে এক আশ্চর্য বেদনা জেগে উঠেছিল।

লেডি ইসাবেলের ঘরে সেই প্রথম দেখার দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হলেন মার্গারেট। তবুও, তবুও মার্গারেটের সংশয় মনে বিরোধ লাগল বার বার। ঘুরে ফিরে স্বামীজির কাছে যাওয়া। মন দিয়ে শুনতেন স্বামীজির বক্তৃতা। লিখে আনতেন। যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে, বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে স্বামীজি তাঁকে যখন শোনাতেন, তখন মার্গারেটের হত যেন নবজন্ম।

স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ; মানুষ কী চায়? কেবল সুখ? কেবলই দুঃখ? সুখ আর দুঃখ নিয়েই তো মানুষের জীবন।

মার্গারেট শুনে পুলকিত হলেন।

মনে পড়ে, প্রিন্সেস্‌হলে 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে যে দিন বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নতুন বাণী। 'শিব শিব' গম্ভীর নিনাদে সমস্ত সভাটা তখন মুখরিত।

আর মার্গারেট সেই সভার মধ্যে দিয়ে যেন নিজেকে খুঁজে পেলেন। তিনি যেন পেলেন এক অজানা জগতের সন্ধান।

মনে পড়ছে মার্গারেট বলেছিলেন : 'স্বামীজি যদি লণ্ডনে না আসতেন, তা হলে হয়ত আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হত না।'

মার্গারেটের জীবনে আশ্চর্য রূপে বিকশিত হলো নূতন প্রেরণার আলোর শিখা। শুরু হল চলার ইতিহাস।

ঘটনার প্রতিধ্বনিতে দেখা যায়—লণ্ডনে যাবার সময় স্বামীজি মার্গারেটকে বলেছিলেন, 'দেশের মেয়েদের জন্য একটা পরিকল্পনা করেছি। মনে হয় তোমার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাবো। ভারতের হাজার হাজার মেয়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। পশ্চিমের একটি মেয়ে এসে যদি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। অবরোধ

রুদ্ধ হিন্দু মেয়েদের অন্তর কুঁড়ির মতই আধ ফোটা। কিন্তু তাদের চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস, আর উৎসাহের অনুপম ঐর্যশ্ব—ত্যাগ আর সহিষ্ণুতা।...ভারতবর্ষ তোমার আপন ঠাঁই। কিন্তু সে জন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে তিলে তিলে।...ভারতবর্ষ আজও মহিয়সী নারী সৃষ্টি করতে পারেনি।...তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব-প্রেম ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তার চেয়েও বড় তোমার রক্তের তেজ ...এই সব আছে বলে ভারতবর্ষের জন্যে চাই ঠিক তোমারই মত এক মেয়ে।'

স্বামীজির এই কথায় সাড়া দিয়েছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের তরুণী মার্গারেট। যিনি নিজেকে ভারতবর্ষের পায়ে নিবেদন করে 'নিবেদিতা' নামে চিরস্মরণীয়া হয়ে রইলেন ধরণীর বুকে।

॥ তিন ॥

স্বামীজি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন।

মার্গারেটের শূন্য মনে প্রেরণা যোগায় গীতা আর বাইবেল। উপনিষদ পড়তে শুরু করলেন তিনি। হিন্দু আর বৌদ্ধ মতবাদের গ্রন্থের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন তাঁর মুক্তির পথ। ধীরে ধীরে মনের মেঘ কেটে গিয়ে আসছে আলোর সংঘাত।

স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরে অগণিত গুণমুগ্ধের দল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামীজি আবার ফিরে এলেন লণ্ডনেই।

মিঃ ই. টি. স্টাডি ছিলেন স্বামীজির অনুগত ভক্ত। তাঁর চেষ্টায় শুরু হল লণ্ডনে ধারাবাহিক ভাবে স্বামীজির জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের কথা।

মার্গারেট রয়েছেন স্বামীজির সঙ্গে ছায়ার মতই। স্বামীজির কাছ থেকে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা শুরু করলেন মার্গারেট। মন

থেকে সরে গেল অন্ধকার। মার্গারেটের মন অসীম পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

সময়ের দ্রুততালে কয়েকটি ঘটনার স্মৃতির সৌরভে মার্গারেট বুঝলেন এবার চাই গুরুর নির্দেশ। তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে হয়, কোন নিশ্চিন্ত সময়ের নির্ভরতায় তাঁর কর্মসাগরে ডুবে যেতে হবে।

অন্তরের ডাকে সাড়া দিলেন স্বামীজি, তাঁর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ঃ তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে। তার মধ্য থেকে আসছে মুক্তি। আমাদের প্রধান কাজ এগিয়ে চলা। হে মহাপ্রাণ জাগো, ওঠো। তোমার কি নিদ্রা সাজে ?

এই মহান বাণী মার্গারেটের অন্তরে গেঁথে যায়। তবু সংশয়ভরা মনে একদিন মার্গারেট বললেন স্বামীজিকে, 'আপনার সব কথা যে বুঝতে পারি, আবার তা মেনে নিতে পারি, আমার প্রকৃতি সে রকম নয়।'

স্বামীজি হাসলেন।

তারপর বললেন : সংশয় ভালো। যাচাই করে—পরীক্ষা করেই তো সত্যকে গ্রহণ করতে হয়। তবেই তো সত্যকে খুঁজে পাবে জীবনে।

মার্গারেট এবার ভাবলেন, এর চেয়ে সত্য আর নেই।

বেদান্তের উদার আদর্শের বেদীমূলে তিনি নিজেকে নিবেদন করবেন। আর এই হবে তাঁর জীবনের সত্য পরিচয় !

দিন যায়। মার্গারেট ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতম হয়ে ওঠেন। কিন্তু সংশয় ঘেরা মন তখনও।

একদিন ঘরোয়া আসরে স্বামীজি বললেন ; ভারতের প্রাচীন তীর্থ আর তার বিখ্যাত শহরগুলির কথা।

মার্গারেট মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন—আমাদের লণ্ডনের মতো শহর কিন্তু আর দ্বিতীয় নেই। শিক্ষা আর শিল্প-সম্পদের গৌরবে এই শহরের তুলনা হয় না।

বীর সাধক বিবেকানন্দ বললেন : খুব সত্য কথা। তারপর হঠাৎ

বিদ্যুতের মত বলে উঠলেন ; কিন্তু একথাও আমরা ভুলিনি যে, এই লণ্ডনের সৌন্দর্যের পিছনে রয়েছে দেশ-বিদেশের কত লুণ্ঠিত সম্পদ। কোম্পানির শাসনের আমলে তোমাদের দেশ লুণ্ঠ করেছে ভারতের অজস্র ধন-সম্পদ। আর তাতেই গড়ে উঠেছে তোমাদের দেশের যত কলকারখানা আর শিল্প প্রতিষ্ঠান। এর প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে।

স্বামীজির কণ্ঠে এ কথা শুনে মার্গারেট বিস্মিত হলেন।

মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। গুরুকে মনে মনে প্রণাম করে বললেন,—আমাকে পথ দেখাও প্রভু।

মার্গারেটের মন চায় এক অনির্বান আলোকের পথে ছুটে যেতে। তাঁর জীবন ও জগৎ যেন বিবেকানন্দময় হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে তাঁর স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠের সেই কথা : আর আমার দেশের দীন দরিদ্র অভাগা ভাই-বোনেরা…

অভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন মার্গারেট, আমি আপনার ওদের মুক্তির জন্য কাজ করতে চাই।

স্বামীজি বললেন : সন্ন্যাসী আমি। আমার সঙ্গে তুমি কাজ করতে পারবে তো ? ভেবে দেখ।

ভাবনার তীরে এলেন মার্গারেট।

স্বামীজি সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন সেভিয়ার দম্পতী। তাঁরাও স্বামীজির সঙ্গে যাবেন।

মার্গারেট ভাবেন। তন্ময় হয়ে ভাবেন।

নিশ্চিত নির্ভরতার আলোকের তীরে এসে প্রতীক্ষা করেন, মনে মনে বলেন, আমায় পথ দেখাও প্রভু।

এগিয়ে চলে কাল। সময় স্মৃতিকে বহন করে। মহাকালের ডাক শোনা যায়। স্বামীজির ডাকে চমকে ওঠেন নিবেদিতা। অন্তরে আলোর বন্যা। নিবেদিত মার্গারেট স্বামীজির পাদপদ্মে।

স্বামীজি বলে চললেন : আজ পৃথিবীতে কিসের অভাব জানো ? আর পৃথিবী চায় এমন কতকগুলি নরনারী যারা রাস্তায় নেমে এসে

বুকে হাত দিয়ে বলবে, ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর কেউ নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্তুত ? মার্গারেটের কণ্ঠে অভয় মন্ত্র।

বুঝলেন ভারতবর্ষ তাঁকে ডাকছে। কণ্ঠে জেগে ওঠে ঃ ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ।

এগিয়ে চলে দিন।

আসে বুঝিবা জীবনের পরম সত্য লগ্ন।

স্বামীজি বললেন ঃ ভালো কথা, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও, চল। সেখানে গিয়ে দীন-দরিদ্রের সেবা করবে।

মার্গারেটের অন্তরে আলোর বন্যা।

স্বামীজি বললেন ঃ আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা পরিকল্পনা করেছি। আমার বিশ্বাস আমি এতে তোমার সাহায্য পাব।

মার্গারেটের জীবনে এলো পরম শুভদিন। বললেন তিনি—পারব, নিশ্চয়ই পারব। আপনার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতেই চাই আমি।

স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ—সেখানে হাজার হাজার মেয়ে আজ তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে আজ যদি তাদের পাশে দাঁড়ায়, তারা সাড়া দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

মার্গারেটের সমস্ত দেহ মন দুলে ওঠে :

আনন্দে বলে উঠলেন ঃ যাব, যাব আমি। আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই যে।

স্বামীজি বললেন—মনে করে দেখ—এখানকার সব কিছু ফেলে যেতে হবে। তোমার অতীত বলে কিছু থাকবে না ? পারবে ? পারবে তুমি ? আমার দেশ বড় গরীব ? পারবে তুমি সেই দারিদ্র্যের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে ?

মার্গারেট অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি পারব স্বামীজি।

স্বামীজি বললেন, বেশ, তবে তাই হোক, তুমি নিবেদিত হও ভারত মাতার চরণে।

কিছুদিন পরে স্বামীজি চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, সময় হলেই তোমার ডাক আসবে। তুমি তোমার মনকে তৈরী করে নাও।

স্বামীজি চলে গেলেন।

মার্গারেটের প্রতীক্ষা। কবে আসবে গুরুর ডাক?

এগিয়ে চলে দিন।

মার্গারেটের মন বুঝি উধাও হয় ভারতের দিকে।

স্বামীজির চিঠি পেলেন। উত্তর দিলেন।

চিঠি-পত্রের মাধ্যমে গুরু-শিষ্যের খবর যায় আর আসে। অধীরা মার্গারেট।

স্বামীজির চিঠিতে কাজের কথা—যাবার কোন তাগাদা নেই।

স্বামীজি লিখেছেন: 'তুমি এখানে না আসিয়া ইংল্যাণ্ড হইতেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করিতে পারিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় তোমার বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

মার্গারেট অধীরা হয়ে উঠলেন।

চোখের জলে প্লাবিত হয়ে জানালেন স্বামীজিকে, 'আর যে অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে যাবার অনুমতি দিন।'

স্বামীজি অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন: 'কাজে ঝাঁপ দেবার আগে ভাল করে ভেবে দেখো। ভারত আজ তোমাকে চাইছে। তোমার মত মেয়ে আজ ভারতের প্রয়োজন। তবুও আসবার আগে ভেবে দেখো, ভুলে যেতে হবে তোমার অতীতকে। পারবে তো?'

মার্গারেটের আর ভাবনা নেই। সন্ধান পেয়েছে নতুন পথের। এলো সেই আসন্ন দিন।

মার্গারেট জানালেন তাঁর মাকে ভারতে যাবার খবর।

মেরী তাঁর মেয়ে মার্গারেটকে বুকে জড়িয়ে বললেন, জন্মের সঙ্গে সংগেই দেবতার চরণে তোকে নিবেদন করেছি।

মার্গারেট যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এলো সেই দিন।

বিদায় দিতে এলেন মা। এলেন বোন, এলেন পরিচিত বন্ধুরা।

মার্গারেট একবার চারিদিকে তাকালেন। কান্নায় দুলে উঠলো লণ্ডনের আকাশ বাতাস। মায়ের চোখে জল। বোনের ও বন্ধুদের চোখেও জল।

আর মার্গারেট ?

স্থির। নিশ্চল। নির্ভয়।

চলে যাচ্ছে প্রিয় মার্গারেট। ভাবময় মার্গারেট। জাহাজ ছেড়ে দিল। নতুন জগতের ডাকে ইউরোপের উপকূল ত্যাগ করে মার্গারেট এগিয়ে চলেছেন আরেক তীরে।

ডাক এসেছে। স্বামীজির ডাকে আসছেন মার্গারেট।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী সাত সমুদ্র পার হয়ে জাহাজ এসে থামলো কলকাতা বন্দরে।

॥ চার ॥

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেন মার্গারেট।

ভারতমন্ত্রই তাঁর একমাত্র জপ। স্বামীজির ধ্যানের ভারত আর তাঁর সাধনাকে সফল করে তুলতে হবে।

এলেন কলকাতা বন্দরে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চারিদিকে তাকালেন। কুয়াশা-ভরা সকালে তিনি তাকালেন চারিদিকে।

দেখলেন চারিদিকে লোক সমাবেশ। স্বপ্নের মত চিত্র সব।

সহাস্যে দাঁড়িয়ে গুরু বিবেকানন্দ। সহাস্যমুখে স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে এলেন অভিনন্দন জানাতে।

অভ্যর্থনায় মার্গারেট অভিভূত হয়ে উঠলেন।

নীরব অনুভূতিতে অভিভূত মার্গারেট। স্বামীজির মত আর একজন সন্ন্যাসী তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

শীতের আশ্চর্য সকালে মার্গারেট যেন স্বপ্ন দেখছেন।

দেখছেন, অনুভবে আর আনন্দে, একদিন যা ছিল অন্তরে, আজ তা মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল।

হেঁটে চলেছেন মার্গারেট—সঙ্গে স্বামীজি। বন্দর ছাড়িয়ে এলেন ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে। এলেন পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে।

এসেছেন মার্গারেট। স্বামীজি পার্ক স্ট্রীটের-বাড়িতে মার্গারেটকে বাংলা শিখাবার জন্য একজন সন্ন্যাসীকে পাঠালেন।

স্বামীজি এই সময় বেলুড় মঠ তৈরীর ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলেন।

হেনরিয়েটা স্কুলের জমি কিনে দিয়েছেন। এসেছেন মিসেস সারা বুল এলেন মিস্ ম্যাকলয়েড্।

স্বামীজি পার্ক স্ট্রীটের বাড়ী থেকে মার্গারেটকে নিয়ে এলেন কলকাতায় বাড়িতে।

আনন্দে অধীরা হয়ে উঠলেন মার্গারেট। ম্যাকলয়েডের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। এখন পরিচয় হল সারাবুলের সঙ্গে।

স্বামীজির কাছ থেকে মার্গারেটের শিক্ষা শুরু। তিল তিল করে তাঁকে গড়ে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ দিয়ে স্বামীজি মার্গারেটকে গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন।

ভারতে এসেছেন মার্গারেট, এ দেশকে চিনতে হবে। এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে হবে তাঁর অন্তরের পরিচয়। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে মার্গারেট এগিয়ে চলেন।

মার্গারেটকে একান্তভাবে ভারতীয় নারী হতে হবে। সেই মন্ত্র শিখে নিলেন মার্গারেট। শিখলেন ভারতের আচার-অনুষ্ঠান। জানলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।

দিন যায়। মার্গারেট বুঝলেন, ভারতের জন্যই আমার জীবন, যৌবন—সব কিছু। ভারতীয় নারী হয়ে চলতে হবে। মনে ও প্রাণে ধ্যান—ভারত আমার। বেদমন্ত্রের মত পবিত্র আর শুভ্র থেকে শুভ্রতর হয়ে ওঠেন মার্গারেট।

দিন এগিয়ে চলে ছায়া-ছবির মতই।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি সভা। স্টার থিয়েটার জনকোলাহলে মুখরিত। উদ্দেশ্য মার্গারেটকে জনসাধারণের সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বক্তা মার্গারেট। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ।

মার্গারেট বললেন তাঁর মনের কথা—সেবা আমার ধর্ম।

অভিভূত হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ। মার্গারেটের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হলেন।

ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসে দিন।

সেবা আর কাজ এই ব্রত নিয়েই মার্গারেট এগিয়ে চলেন।

মার্গারেট বললেন: বলুন স্বামীজি, কি করলে সব চেয়ে বেশী আপনার সেবা করতে পারি।

স্বামীজি সস্নেহে বললেন: ভারতকে ভালবেসে। ভারতবর্ষের সেবা করে।

মার্গারেট খুশীর আবেগে ঝলমলিয়ে উঠলেন। তবুও মনে মনে সংশয় মার্গারেটের। কবে গড়ে উঠব আমি?

গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। শিষ্যা মার্গারেট।

স্বামীজি বললেন: ভবিষ্যতের কাছে কোন আশা কর না। আত্ম-নিবেদন যেন বড় না হয়ে ওঠে।

দিন এগিয়ে চলে।

শিক্ষা আর সাধনার ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেন নিবেদিতা। মনে ভাবেন কবে আসবে আমার সেই শুভদিন? যে দিন আমার হবে নবজন্ম। আমার হবে দীক্ষা। নিবেদিত হতে চান মার্গারেট।

স্বামীজি বলেন, এখনো সময় হয়নি। ভুলে যেতে হবে তোমার অতীতকে। তিল তিল করে প্রস্তুত হতে হবে তোমার। তুমি নিবেদিত হবে মায়ের চরণে।

মার্গারেটের অধীর প্রতীক্ষা।

মহাকাল জেগে ওঠে। আসে বুঝিবা সেই শুভদিন।

সবার মা সারদা।

শ্রীমার চরণে প্রণাম জানাতে এলেন মার্গারেট।

ভারতের মাটিতে পা দিয়ে এই প্রথম দেখা। সঙ্গে এসেছেন আরও দু'জন বিদেশিনী। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড।

সবার মা সারদা রয়েছেন বাগবাজারে। বিদেশিনীদের ছায়া পড়ল মায়ের চরণে। সবার মা সারদা সস্নেহে ওদের বসালেন। মার্গারেট দেখছেন মাকে বার বার। সবার মাও দেখছেন নিবেদিতাকে।

মার্গারেট ভাবছেন—কি অদ্ভুত আমার মা, এ যেন চিরকালের মা! মাগো তোমাকে দেখে জীবন ধন্য। কী অপরূপ সৌন্দর্য তোমার!

শ্রীমার মুখে অপূর্ব জ্যোতি। মা বললেন এসো মা, এসো। এতো তোমারই দেশ।

মা সারদা আবেগে বিভোর বিদেশিনীদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কোন যাদু বলে যেন সব এক হয়ে গেল।

এলেন বিবেকানন্দ। মাকে প্রণাম করে বললেন, মার্গারেটের দীক্ষা দেবার সময় হয়েছে।

মা আশীর্বাদ করলেন মার্গারেটকে। বললেন, জীবনে জয়ী হও। অন্তরে আলোর বন্যা নিয়ে ফিরে এলেন মার্গারেট।

অবশেষে এলো সেই দিন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিবেকানন্দ দিলেন দীক্ষা।

ব্রহ্মচারিণী হলেন মার্গারেট। রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সাধিকা হলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলেন সব, নিজের অতীত—নাম, গোত্র, জাতি—সব কিছু বিসর্জন দিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

কালের ইতিহাসে নবজন্ম। নতুন নাম নিবেদিতা।

গুরুর দেওয়া নামে, গুরুর দেওয়া মন্ত্রে জেগে উঠলেন নিবেদিতা। শুরু হল তাঁর নতুন জীবন। ভারতের মাটির সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন নিবেদিতা।

নিজেকে এমন ভাবে উৎসর্গ করার দ্বিতীয় উপমা আর নাই।

॥ পাঁচ ॥

এলো নিজেকে চেনার শুভলগ্ন।

বীর বিবেকানন্দের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নতুন পথের নির্দেশ পেলেন নিবেদিতা।

স্বামীজি ভাবলেন, এবার নিবেদিতাকে চেনাতে হবে ভারতবর্ষকে। জানাতে হবে ভারতের চিরন্তন রূপকে।

স্বামীজির সঙ্গে চলেছেন নিবেদিতা আর তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা।

উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ হল।

এই দেশভ্রমণ কালে নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে লিখেছেন : 'এমন সব মুহূর্ত আসিয়াছিল, যাহা ভুলিয়া যাইবার নহে। এমন সব কথা শুনিয়াছি, যাহা আমাদের মনে সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনি তুলিবে। আর অন্তরে জাগিয়া রহিবে হিমালয় ভ্রমণ।'

শুরু হল শুভযাত্রা।

নিবেদিতা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মে মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল. একটির পর একটি জায়গায় যখন আমরা এলাম, স্বামীজি তখন দেখিয়ে দিলেন ভারতের আসল রূপ। শুধু কি তাই? আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত, খামার, গ্রামবহুল সমতল ভূমি অতিক্রম করে যাওয়ার সময় স্বামীজির প্রেম এমন উথলে উঠতো, যা নিজেদের চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না। ......একদিন বিকেল বেলা তরাই অঞ্চল পার হয়ে চলেছি, সেই সময় স্বামীজি আমাদের মনে

করিয়ে দিলেন যে, এই যে তীর্থভূমি আজ তা ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিতীর্থ রূপে পরিণত হয়ে আছে।"

নিবেদিতা হিমালয়ের প্রকৃতির কোলে, তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজিকে তিনি দেখতে পেলেন এক বিরাট পুরুষ রূপে .....।

শুরু হয় শুভযাত্রা।

এগিয়ে চলেছে ট্রেণ হিমালয়ের বুক চিরে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখছেন নিবেদিতা। দেখলেন, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের মূর্তি। শুনলেন মন্দিরে মন্দিরে দেবতার নাম গান। সবই যেন নতুন করে চিনলেন নিবেদিতা।

নৈনিতালে এলেন সবাই। ছুটে এলেন খেতড়ির রাজা।

স্বামীজিকে ঘিরে মুখর হয়ে উঠল পাহাড়ের গায়ে রাজপ্রাসাদ! পাহাড় আর গাছ দিয়ে ঘেরা এই মন্দির, নিবেদিতা আর তাঁর সঙ্গিনীদের তাঁবু পড়ল এইখানে।

মুগ্ধ নিবেদিতা। বিস্মিত।

স্বামীজির ভাষণে নিবেদিতা বুঝলেন দেশই সব। ভারতবর্ষ তার গুরুর ধ্যান।

এরপর এলেন আলমোড়ায়।

সন্ন্যাসীরা উঠলেন ঘোড়ার পিঠে। মেয়েরা গাড়িতে।

গভীর বন-জঙ্গল। চারিদিক সজ্জিত ফুল আর ফুল। দেবদারু আর পাইন গাছগুলো সব হাওয়ায় দুলছে।

হিমালয়ের রাজত্বে এসে নতুন একটা অনুভূতির মধ্যে ডুবে গেলেন নিবেদিতা। এখানে এসে শ্রীমতী য়্যানি বেশান্তের বাসভবনে এলেন নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজি। নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হল য়্যানি বেশান্তের। ঘরোয়া আলোচনায় মুখর হলেন স্বামীজি। ইতিহাস, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে তর্ক হল নিবেদিতাকে ঘিরে।

তারপর ছুটে এলেন সেভিয়ার দম্পতিও। সেখানে সবাই মিলিত হলেন।

আনন্দে উথলে উঠলেন সবাই। প্রকৃতির লীলানিকেতন। দু'জন বিদেশিনী মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু নিবেদিতা ?

তা'র মনে হলো, এই বিশাল পৃথিবী আর প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে আজ অন্য এক জগতের খবর।

স্বামীজি বাইরে কঠোর।

শুধু বললেন—'চলো, চলো, এগিয়ে চলো

নিবেদিতার মনে সংশয়।

স্বামীজির যেন আর আগের মত তাঁর প্রতি আগ্রহ নেই। সংশয় ঘেরা মন, মনে হয় এ যেন এক নতুন স্বামীজি। মনে পড়ে, স্বামীজিকে যখন ইংলণ্ডে প্রথম পরিচয়ে দেখেছিলেন, এখন যেন তাঁর অন্য রূপ।

নিবেদিতার মনে আলোড়ন জাগে। মনে মনে ভাবেন, স্বামীজি যেন তাঁর প্রতি মনোযোগী নন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। মানসিক বিক্ষোভ এল মনে মনে।

নিজেকে ভুলে গিয়ে নিজের সমস্ত অতীতকে ভুলে গিয়ে তাঁর মনে মনে প্রার্থনা স্বামীজির অভয় বাণী : তোমাকে হতে হবে দীন, শরণাগত, এই কঠোর ব্রতেই হবে তোমার জয়

ক্রমশ দিন বদলের পালা শেষ।

স্বামীজি চলে গেলেন কিছুদিনের জন্য বাইরে। কেননা, নিবেদিতার মনে যে সংঘাত তাকে দূর করতে হবে।

এলো শুভ সময়। নিবেদিতা বিকশিত হলেন। তাঁর মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেলো। মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বুঝলেন—নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে গুরুর কাছে নিজেকে সঁপে দেব।

নিবেদিতার এই সংকট সময়ে, যখন স্বামীজি কাছে ছিলেন না, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন, অন্ধকারে পথ ধরে চলেছি। আমার যাত্রালোকে যেন পরম সত্য স্থিরতাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে খুঁজছি। জানিনা এ চলা পথের শেষ কোথায় ?

ফিরে এলেন স্বামীজি।

সামনে আনত মুখে কান্নায় অধীরা নিবেদিতা বললেন, আমাকে পথ দেখান।

নিবেদিতাকে বললেন স্বামীজি: ভুলে যেতে হবে তোমার অতীতকে। তোমার আচার-ব্যবহার সব কিছু হিন্দু-নারীদের মত করে তুলতে হবে। তুমি যে ব্রহ্মচারিণী।

চোখের জলে প্লাবিত নিবেদিতার নবজন্ম। এই আলমোড়ায় পেলেন নিবেদিতা নতুন জীবনের পথ।

এলেন এবার ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে। আলমোড়া থেকে কাশ্মীর। কাশ্মীরের চির সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করলো।

ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল সব।

এল আবার নতুন পথের নিশানা।

স্বামীজির মন তখন ছুটে চলেছে আরেক জগতে।

বীর সাধকের কণ্ঠে অভয় বাণী।

তাঁর নিশানা অমরনাথের দিকে: চলো চলো এগিয়ে চলো।

অনুভব আর অপরিসীম তৃপ্তি নিয়ে নিবেদিতা চলেছেন। তাঁরও মনে বিপ্লব। কণ্ঠে গান।

বুঝলেন অমরনাথে চলেছেন তিনি। সেইখানেই হবে তাঁর অগ্নি পরীক্ষা। অশ্রু সাগরে বিলীন নিবেদিতা। মৌনতায় প্রার্থনা, পথ দেখাও, পথ দেখাও—নিয়ে চল আমাকে।

বীরসাধকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, চলো চলো এগিয়ে চলো।

কাশ্মীরের চিরপবিত্র দুর্গম তীর্থ অমর নাথ। তুষারে ঢাকা চিররহস্যে ঘেরা এই তীর্থ পথ।

শুরু হল আকাঙ্ক্ষিত শুভযাত্রা। তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে চলেছেন নিবেদিতা। স্বামীজির নির্দেশমত সবাই চলা শুরু করেছেন।

নিবেদিতা অনুভব করলেন, দেবীর দর্শন লাভের জন্য তাঁর মন ভীষণ ব্যাকুল।

কি অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা দীর্ঘ দুর্গম পথ। সন্ধ্যাকাশ আরও

রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এবার অগ্রসর হতে হবে দুর্গম গিরি রহস্যকে অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে।

স্বামীজির নির্দেশমত নিবেদিতা সকলের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলেছেন।

পথের দু'ধারে তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

উঁচু, নীচু ভাঙ্গা রাস্তা পার হলেই পঞ্চনদের সঙ্গমস্থল। সেখান থেকে হিমপ্রবাহের মধ্যে একটি রাস্তা। সেই রাস্তা শেষ হলেই অমরনাথ গুহা।

এলেন অমরনাথে।

নিবেদিতা এলেন। দেখলেন, ধ্যানমগ্নতায় বিলীন স্বামীজি। পরমলগ্নে মহান তপস্যায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন নিবেদিতা।

মহাসাধক মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাঁর সম্মুখে। নিবেদিতার মনে তবুও সংশয়। সব উজাড় করে দিয়েও কেন এ শূন্যতা।

বীর সাধক বুঝলেন সব। বললেন, পথই তোমার সত্য হোক।

কালের ইতিহাসের সাক্ষী রয়েছে নানাপ্রকার চিত্র। তাই এই ভ্রমণ কালে নিবেদিতা ফিরে এলেন আপন বিশ্বাস আর চলার গতি সম্বল করেই।

অমরনাথ থেকে ক্ষীরভবানী। একা গেলেন স্বামীজি।

যাবার আগে বলে গেলেন, অমরনাথে এসে নিজেকে ফিরে পেয়েছি—সেখানে পেয়েছি ইচ্ছামৃত্যু। আকুল হয়ে ডাক মাকে। অন্তরে সাড়া দেবেন মা।

চলে গেলেন গুরু।

নিঃসঙ্গ নিবেদিতা। আলোর পরশ পেলেন।

ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে এলেন স্বামীজি। এসে দেখলেন ভক্তি আর বিশ্বাসে ভরা মায়ের পাদপদ্মে নিবেদিতা।

শ্রীনগর থেকে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

এই উত্তর ভারত ভ্রমণকালে নিবেদিতা তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে দেখা গেছে শিষ্যের প্রতি গুরুর যে অসীম আকুলতা, তাই প্রতিফলিত তার জীবনে।

কর্মজগতে প্রবেশ করবার জন্য উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে নিবেদিতা ফিরে এলেন কলকাতায়।

শুরু হল কর্মজীবন।

॥ ছয় ॥

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিদ্যালয়।

স্বামীজি এই বিদ্যালয়ের নাম দিলেন। আর এই বিদ্যালয়ের শুভপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন সবার মা শ্রীশ্রীসারদামণি।

স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ করলেন প্রাণভরা আশীর্বাদ।

যেদিন বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল, সেদিন ছিল দীপান্বিতা। সারা শহরে সেদিন আলোর মেলা।

মঙ্গল ধ্বনিতে মুখর প্রতিটি গৃহ। প্রদীপের মালায় শোভিত দিক্-দিগন্ত।

আর নিবেদিতা! তিনি জ্বালালেন জ্ঞানের আলো। যে শিখায় মুখর হয়েছে বাংলার নবনারী।

স্বামীজির নির্দেশমত নীচের তলায় স্কুল বসানো হলো। সদর দরজার পাশে যে বৈঠকখানা, তার এপাশে কোন পুরুষের বা অন্য কোন দেশীয় মেয়েদের আনাগোনা হবে না।

কর্মতালিকা প্রস্তুত করে দিলেন নিবেদিতা।

স্বামীজি বললেন, নিজেকে চেনার সুযোগ এসেছে তোমার। এগিয়ে চলো তোমার কাজে।

স্বামীজির নির্দেশ মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন নিবেদিতা।

মঠ থেকে এলেন স্বামী সদানন্দ।

নিবেদিতাকে দেখা-শোনার ভার নিলেন শরৎ মহারাজ।

সদানন্দের মুখে রামায়ণের গল্প শুনে মুগ্ধ হলেন নিবেদিতা।

যাছুর মত সব ঘটে যাচ্ছে নিমিষে। দেখতে দেখতে সময়ের দ্রুত তালে এগিয়ে চলে দিন। স্কুল গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেন বাগবাজারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

মনের মত করে মিশলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে সরগরম হয়ে উঠলো বাগবাজারের গৃহাঙ্গন।

নিবেদিতার শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অভিনব। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শেখাতেন খুব সহজ করেই। শিক্ষা দিতেন রং, তুলি আর ছবি দিয়ে। শেখাতেন পুতুল গড়া, সূঁচের কাজ। তেঁতুলের বীচি গোনা থেকে শুরু করে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প পর্যন্ত।

সকলের মন জয় করে নিবেদিতা এগিয়ে চলেন তাঁর পথে।

শ্রীশ্রীসারদামণি স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন নিবেদিতাকে। কল্যাণীর প্রতিমূর্তি নিবেদিতা মায়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, আমার মনে হত ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ বাণী তিনিই।…খুবই সরল স্বভাবের মেয়েদের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায়, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সারদা দেবীর কাছে। তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ, মন ছিল উদার।

শ্রীসারদামণির প্রসঙ্গ উঠলেই নিবেদিতা অধীর হয়ে উঠতেন। যখনই তিনি নিজেকে একা ভাবতেন, তখনই চলে আসতেন মায়ের কাছে।

আর মা?

তাঁর স্নেহ সুধায় নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছিলেন অন্তর দিয়ে।

মা ডাকতেন তাঁকে খুকী বলে।

শ্রীশ্রীসারদামণি বলতেন, খুকী তো এই দেশেরই মেয়ে। ও আর

জন্মে আমাদের কেউ ছিল, ঠাকুরের কথা প্রচার করবার জন্যেই ও' সেখানে জন্মেছে, নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। কি গুরুভক্তি।

একদিন নিবেদিতা অভিমান করে বললেন মাকে, "মা, ভারতের সব কিছু শিখলাম, কিন্তু ভারতীয়দের মত পা মুড়ে বসবার কায়দাটুকু শিখলাম না।"।

মা হাসলেন।

আর একদিন বিকালে এলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা মায়ের শেখানো বাংলায় বলেন, 'এ মাট্রি দেবী আপনি হন আ-মা-ডিগের কালী।'

খুশীর প্রতিধ্বনি করে ওঠেন ক্রিস্টিন, বলেন, 'Oh yes holly mother is our Kali'.

মায়ের মুখে প্রসন্নতা। বলেন মা, বাপু, আমি কালী হতে পারব না? জিভ বার করে থাকতে হবে আমাকেই।

বলেন, 'মাগো, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরা তোমাকে দেখব কালীরূপে। কেননা ঠাকুর যে আমাদের মহাদেব।

মায়ের নীরবতায় প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন নিবেদিতা বলেন নিবেদিতা, 'মাগো, তোমার চরণে যেন স্থান পাই আমি।'

হাসেন মহামায়া।

আর একদিন বিকেলবেলা। স্বামীজি তখন অমরলোকে।

নিঃসঙ্গ নিবেদিতা এলেন মাকে প্রণাম জানাতে।

মা বললেন, 'খুকী কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি তোমায় গেরুয়া পরতে। নেবে দীক্ষা?'

নিবেদিতা কান্নায় অধীরা। বলেন, 'না মা, তা হয় না। গুরু আমাকে দিয়ে গেছেন সন্ন্যাস। তিনি দিয়েছেন দীক্ষামন্ত্র ...। আমি তাঁরই উপাসক। তাঁরই নির্দেশে আমি চলব!'

অসাধারণ গুরুভক্তি ছিল নিবেদিতার, যা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

সব কিছুর উদ্দেশ্য হল একটি আদর্শকে জাগিয়ে তোলা।

মানুষের সেবা…রুগ্নের সেবা…নিরন্নকে অন্নদান।

গুরুর আদর্শকে সামনে রেখে নিবেদিতা ভারতের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

মনে পড়ে তখনকার সময়ে কলকাতায় প্লেগ এসে ভয়ের সঞ্চার ঘটাল। আর নিবেদিতা এগিয়ে এলেন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে। স্বামীজির সাহায্যে সমিতি খুললেন, তার সম্পাদক হলেন নিবেদিতা স্বয়ং।

এই মহামারী প্লেগে নিবেদিতা যে ভাবে জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছেন তার তুলনা নেই। সেবার আদর্শকে সফল করে তুললেন তিনি। দেশসেবা, জনসেবা, মানব প্রীতির সব কিছুকে গ্রহণ করে তিনি হলেন বিজয়িনী।

ভয়াবহ প্লেগ রোগের বিরুদ্ধে নিবেদিতার অভিযান সফল হল। সারা বাংলা দেশ এই অসামান্যা নারীর নামে মুখর হয়ে উঠল।

প্রথম দীক্ষার পরের পর্ব। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ।

নিবেদিতাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর পদে ভূষিতা করলেন স্বামীজি। জীবনের বৃহত্তর কাজের মধ্যে নিবেদিতা মিশনের একজন হয়ে গেলেন।

স্বামীজির নির্দেশ মত কাজ করেন নিবেদিতা।

সন্ন্যাসীদের দীক্ষা দেবার ব্রত নিবেদিতার হাতে তুলে দিলেন স্বামীজি। শেখাতে আরম্ভ করলেন তাদের উদ্ভিদ বিদ্যা আর শরীর বিদ্যা।

নিবেদিতা এগিয়ে চলেন নতুন পথে।

কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত স্বামীজি। তবুও কাজের বিরাম নেই। স্বামীজি শায়িত হয়েই কাজ করেন।

চিঠি এসেছে মিস ম্যাকলয়েড্ আর বুলের কাছ থেকে। নিবেদিতা চিঠি পড়ে শোনান।

নিবেদিতা বললেন, এবার চলুন আমেরিকায়। ওখানে গেলে আপনার শরীর ভাল হয়ে যাবে। ম্যাকলয়েড আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

হাসলেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতার কথাকে মেনে নিলেন তিনি।

স্বামীজি বলেন, 'জেগে ওঠ···আমার ধ্যানের ভারতকে গড়ে তোলো। তোমার কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর পথ খুঁজে পাবে।'

নিবেদিতা বলেন, কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে আমি সাহায্য করবো।

এগিয়ে চলে দিন।

নিবেদিতার বিদ্যালয় চলেছে আশা আর আনন্দের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিলেন নিবেদিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্রী এখন মাত্র তিনজন।

ছাত্রী সংগ্রহ করে এনেছেন স্বামী সদানন্দ।

মনের মধ্যে অপার ভালবাসা আর আনন্দ নিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে গেলেন।

নিবেদিতা পরিপূর্ণ মন দিয়ে অনুভব করলেন এদের কি শিক্ষা দেবেন। তিনি বুঝলেন এ দেশের মেয়েরা গড়ে উঠে পরবর্তী জীবনে প্রকাশ পাবে মায়ের রূপে ··বোনের রূপে।

নিবেদিতা স্থির ভেবে নিলেন, এরা যা চাইছে তাই দিয়েই এদের শেখানো দরকার।

সেবা আর ধর্মের মহান ব্রতের সঙ্গে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে তুলে ধরলেন সকলের সামনে।

শুধু কি তাই ?

দেখতে দেখতে সময়ের দ্রুততালে এগিয়ে এলেন নিবেদিতা। পরিপূর্ণভাবে ভারতের মাটিকে চিনলেন। শুরু করলেন তাঁর সাহিত্য-সাধনা। রচনা করলেন নতুন যুগের নতুন কথাই। সনাতন ভারতের চিরন্তন রূপকে প্রকাশ করলেন তাঁর অমর লেখনির মাধ্যমে।

নিবেদিতা সকলের সামনে এগিয়ে এলেন তাঁর লেখার ও কাজের মধ্য দিয়ে।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নিবেদিতা একটি আশ্চর্য নাম। সাহিত্যে, শিল্পে সেবায় তাঁর দান অসামান্য হয়ে আছে।

বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে সে দুর্লভ অধ্যায়।

নিবেদিতা ভারতের সমস্ত রূপটি অনুভব করতেন।

স্মরণের সেই স্মৃতিতীর্থে মনে পড়ে, বাগবাজারের বাড়ি মুখর হয়ে উঠত বাংলার তথা ভারতের মনীষী, দেশসেবক, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের আনাগোনায়।

নিবেদিতাকে ঘিরে তখনকার কালে যাঁরা আসতেন তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে:

আসতেন মহামতি গোখেল, বালগঙ্গাধর তিলক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অরবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার শিশিরকুমার ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি।

এইসব মহান মনীষীদের আনাগোনায় নিবেদিতা সৃষ্টি করলেন দুর্লভ ইতিহাস।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজসেবা একদিকে—অন্যদিকে, চলে দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত বিপ্লবী দলের অন্যতম প্রেরণাময়ী নিবেদিতার নতুন বিপ্লবের ইতিহাস।

বিস্ময়কর জীবনের ঘটনা আরও বৈচিত্র্যময়।

নিবেদিতার স্কুল দেখতে এলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ সুরেন্দ্রনাথ নিবেদিতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলেন। সুরেন্দ্রনাথের মনে মানব স্বাধীনতার বিপ্লবের জ্বালা। তরুণ সুরেন্দ্রনাথের চোখে নিবেদিতা হয়ে ওঠেন আদর্শের আলো।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ব্রাহ্ম-সমাজের আমন্ত্রণে নিবেদিতা যে সব

বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে ঠাকুর বাড়ীর অনেকেই মুগ্ধ হলেন। তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গেলেন নিবেদিতা। নির্জনতার সঙ্গে তাঁর মিতালী।

বিশ্বকবির জনক দেবেন্দ্রনাথকে দেখে বিস্মিত নিবেদিতা। এমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ ভাগ্যের কথা।

নিবেদিতা মহর্ষিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন।

মহর্ষি খুশী হয়ে বলেন,—এসো, আবার এসো। একবার বিবেকানন্দকে আসতে বলো। ওকে দেখেছিলাম সেই একবার—ওর বয়স তখন অল্প।

পরম পুরুষ আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে একবার তরুণ বয়সে অশান্ত মন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। সে সব ঘটনা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

মহর্ষিকে দর্শন করে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

আর একটি নামের সঙ্গে পরিচিত হলেন নিবেদিতা। তিনি হচ্ছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তখন ভারতের মধ্যমণি।

বিজ্ঞানের জগতে তাঁর দান চিরস্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের নিবিড় প্রীতির সহিত পরিচিত হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

জোঁড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ির পরই জগদীশচন্দ্রের বাড়িই নিবেদিতার প্রধান আকর্ষণ। জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী লেডি অবলা ও স্নেহ করতেন তাঁকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা অক্ষুন্ন ছিল। স্মরণ তীর্থ পথে মানস্ চোখে ভেসে ওঠে এই মহিয়সী নারী।' নিবেদিতার স্মৃতিকে অমর করে রাখা হয়েছে—জগদীশচন্দ্রের 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে।'

আজ যদি কেউ 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র প্রবেশদ্বারে যান, দেখতে পাবেন শ্বেতপদ্ম ফুলে পরিপূর্ণ একটি জলাশয়ের মধ্যে দীপ হাতে একটি নারী দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাচ্ছেন। তিনিই ভগিনী নিবেদিতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরিচয়ে কিরকম মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল, তখন তিনি অতি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে এসেছেন। আমি ভেবেছিলাম সাধারণত ইংরাজ মিশনারি মেয়েরা যেমন হয়ে থাকেন ইনিও সে রকম। কেবল এঁর ধর্ম সম্প্রদায় স্বতন্ত্র। তারপর নানাদিক থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নিজেকে এমন করে উৎসর্গ করে দেবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষের ছিল না।

বিশ্বকবির লেখা ও সুন্দর রচনা ভগিনী নিবেদিতার চোখে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়।

নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে প্রায়ই কবি আসতেন। নিবেদিতাও যেতেন কবির বাড়িতে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্মৃতির পরিচয় মধুর ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে বললেন : "মূর্তি পূজা যদি একান্ত প্রয়োজন—তা হলে এই বীভৎস কালী পূজা করা কেন?"

নিবেদিতা বলেছিলেন : আমি মূর্তির আরাধনা করি না।

মহাকালের গতিতে ভেসে ওঠে আরেক ছবি!

স্বামীজি বললেন, এবার তোমাকে বলতে হবে মহাকালীর সম্বন্ধে যা যা তুমি জেনেছ, বুঝেছ, যা তোমার মন বলে তাই বলবে তুমি।

অ্যালবার্ট হলে বিরাট সভা।

সনাতন ধর্মকে দেহ ও মনের সঙ্গে এক করে বলে চলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার ভাষণ শুনে বিস্মিত সবাই।

আবার এলো ডাক। এবার ডাক এসেছে কালীঘাট থেকে।

কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে ভাষণ দিতে হবে।

অভয় দিলেন বিবেকানন্দ।

এলেন নিবেদিতা। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ।

স্বামীজির আশীর্বাদ নিয়ে আজ এসেছেন নিবেদিতা।

এলেন মন্দিরে। সমবেত ভক্তরা অধীর।

নিবেদিতার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাকালীর অপরূপ মূর্তি। রূপে আর অপরূপে তিনি দেখলেন মহাকালীর বিরাট শক্তির ছায়ায় তাঁর আশ্রয়।

নিবেদিতার কণ্ঠে আশ্চর্য ধর্মের কথা শুনে সমবেত জনতা স্তব্ধ।

আর নিবেদিতা? ভাবে আবেগে বিভোরা, শুধু বলেন: আমি মায়েরই দাসী। আমি মায়েরই মেয়ে। মা গো···আমি তোমায় ভালবাসি। বলতে বলতে চেতনা হারালেন নিবেদিতা।

স্বামী সদানন্দ স্তম্ভিত।

॥ সাত ॥

আমেরিকা থেকে মিস ম্যাকলয়েড্ চিঠি লিখেছেন নিবেদিতাকে, "স্বামীজিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো। আমরা আছি···।

নিবেদিতা এখানকার সব খবর জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, 'টাকা না হলে স্কুল চালানো যাবে না। তা ছাড়া মঠের অবস্থাও ভাল নয়।'

বিবেকানন্দ বললেন, আমার যাবার সময় হয়েছে, অমরনাথে আমি বর পেয়েছি, চলে যাবার ডাক···।

নিবেদিতা ম্লান হতাশার মধ্যে নিজে সাজালেন গুরুকে।

বললেন: চলুন আমার সঙ্গে। আমাকে বিশ্বাস করুন।

হাসলেন বীর বিবেকানন্দ; চলো, এগিয়ে চলো। সামনে তোমার নির্দিষ্ট পথ। পেছন ফিরে আর তাকিয়ে লাভ নেই। চলো ঠাকুরের নামে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ি। তোমার ওপর অনেক নির্ভর করেছি আমি। মায়ের চরণে তোমাকে নিবেদন করেছি।

নিবেদিতার অন্তরে আলোর বন্যা।

শুরু হল যাত্রা। স্বামীজি, নিবেদিতা আর স্বামী তুরীয়ানন্দ।

জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, সমুদ্রের হাওয়ায় দুলছে।

এলো অবশেষে কলম্বো বন্দরে। বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, তুরীয়ানন্দ নামলেন।

'জয় বিবেকানন্দ' মুখরিত হয়ে ওঠে বন্দর।

নানা বর্ণ, নানা জাতির সমাবেশ।

তারই মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা। জাহাজ আবার চলেছে পশ্চিমের পথে। এই সমুদ্র যাত্রায় অপার শক্তি হলেন নিবেদিতা।

বিবেকানন্দের পরিচয় যেন নতুন করে দিলেন। চলতি পথে, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক সমাজ সেবা, ধর্ম সাহিত্য নিয়ে

কথা প্রসঙ্গে বললেন স্বামীজি ; তোমার সমস্ত কামনা বাসনা তাঁর চরণে নিবেদন কর। তিনিই তোমাকে দেখাবেন পথ।

এলেন লণ্ডনে লণ্ডনে স্বামীজির থাকার ব্যবস্থা হল নিবেদিতার মায়ের আশ্রয়ে।

মা মেরি নোবল স্বামীজিকে সাদরে বরণ করে নিলেন। মেয়েকে অনেক দিন পর দেখে খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। দেশের চরণে নিবেদিতা তারই মেয়ে আজ ফিরে এসেছে তারই কাছে।

আর নিবেদিতা। মাকে দেখে অধীরা হয়ে উঠলেন।

খবর পেয়ে ছুটে এল প্রিয়জনেরা।

নিবেদিতা অনেক দিন পর নিজের ঘরে এসে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতি খুঁজে পেলেন।

খুশীতে উল্লসিত তাঁর বোন মে। কেন না তাঁর বিয়ে। তাঁকে আশীবাদ জানালেন নিবেদিতা।

নিবেদিতাকে ঘিরে কলগুন্জন।

লণ্ডনে বেশি দিন স্বামীজি থাকলেন না।

স্বামীজি আমেরিকার দিকে অগ্রসর হলেন।

নিবেদিতা তাঁর বোনের বিয়ের পর ফিরে এলেন নিউইয়র্কে।

কমসাগরের বিরাট বন্যায় ডুবে গেলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা এসেছেন নিউইয়র্কে।

স্বামীজি তখন অতিথি হয়ে রয়েছেন মিসেস লেজেটের বাড়িতে।

গুরু আর শিষ্যার কথা মধুরতর হয়ে ওঠে। আদর্শ আর আলোচনায় বিবেকানন্দের বাণী হয়ে উঠল হিরণ্ময়।

গুরু বললেন—সমাজ সংসার সব ভুলে যেতে হবে। তোমার সাধনায় জয়ী হও তুমি।

কর্মপ্রবাহের আসন্ন ডাকে ঝড়ের মত ছুটে চলেন নিবেদিতা। রুদ্রাণী তেজে ছুটে চলেছেন নিবেদিতা।

স্বামীজি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-জনের মণি-কোঠায় স্থায়ী হয়ে গেলেন।

এগিয়ে চলে দিন।

কর্মসাগরে ঝাঁপ দেবার আগে স্বামীজি বললেন তাঁর মানস-কন্যাকে, এখন থেকে তোমার যাত্রা হবে শুরু। তুমি একক। অক্ষয় আশীর্বাদ জানিয়ে গুরু চলে গেলেন। নিবেদিতা একা রইলেন। নির্জনতার সাথী হল তাঁর সাহিত্য-সাধনা।

স্বামীজির নিদেশ—এবার তোমাকে যেতে হবে শিকাগো।

স্বামীজি এবার যাবেন মিসেস বুলের সঙ্গে নিউইয়র্কে। আর নিবেদিতা শিকাগোয়।

দুটি পথ দু'দিকে যাবে। কিন্তু নিশানা একটা।

'ঠাকুর যা কিছু দিয়েছিলেন সবই তোমাকে দিয়ে গেলাম।' বীর বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবেগময় ধ্বনি।

আর নিবেদিতা বুঝলেন—অন্তরে অন্তরে এত শক্তি, এত আলো কোথা থেকে এলো? স্বামীজির কর্মকে সফল করে তুলতে হবে, এই কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝড়ের মত এগিয়ে চলেন নিবেদিতা।

উদ্দেশ্য—অর্থ সংগ্রহ। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নিবেদিতা এলেন। সঙ্গে রয়েছেন ওলিয়া।

দীর্ঘ সাত মাস ধরে শিকাগো শহরে তার আশ-পাশে নিবেদিতা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

নিবেদিতা বললেন, আমি নিজের কথা বলতে আসিনি। আমি বলছি ওদের কথা। প্রচারক আমি নই। ভারতে হিন্দু মেয়েদের জন্য একটি নিজ প্রতিষ্ঠান চাই। নিবেদিতার কথায় সমস্ত শহর মুখর হয়ে উঠলো।

নিবেদিতা এসেছেন আবার নিউইয়র্কে। এখানে পরিচয় হ'ল পেট্রিক গড্ডেসের সঙ্গে। লেজেটের ওখানে আবার দেখা পেলেন তিনি মিস ম্যাকলয়েড আর মিস বুলের।

প্যারিস যাত্রা শুরু হবে। যাবার পথে নিউইয়র্কে এক সভায় নিবেদিতা আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা করলেন। স্বামীজি সেই সভায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভারত-কন্যা নিবেদিতার কণ্ঠে ভারতের জয়গান শুনে তিনি বিস্মিত হলেন।

বিবেকানন্দ চলেছেন প্যারিস।

ধর্ম মহাসভা সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব সেখানে।

নিবেদিতাও প্যারিসে। প্যারিসে এসে গড্ডেসের সেক্রেটারী হয়ে কাজ করতে লাগলেন তিনি।

জীবতত্ত্ব বিশারদ, বিজ্ঞানী প্যাট্রাকির সঙ্গে তাঁর মতের অনেক অমিল। এখানে নিবেদিতার কাজ ছিল প্রতিদিনকার অধিবেশনের ভাষণ গুলো তৈরী করে, সেই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া।

ঠিক সেই সময়ে আর একজন ভারতীয় পুরুষের আবির্ভাব হলো প্যারিসে। তিনি হচ্ছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে স্ত্রী লেডি অবলা বসু এসেছেন।

প্যারিসে এসেছেন বিবেকানন্দ। এখানে এসে ফরাসী শিল্পী জুল বোয়ায়ের আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। মিসেস বুলের সঙ্গে পরামর্শ হলো, বেলুড় মঠের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি করে হতে পারে? মিসেস বুল স্বয়ং নিলেন দায়িত্ব। স্বামীজি এবার ফিরে যাবেন ভারতে।

ইংলণ্ডের পথে পাড়ি দেবেন নিবেদিতা।

স্বামীজি বললেন, কাজ করে যাও, তার মধ্য থেকে সব খুঁজে পাবে তুমি।

মিস ম্যাক্‌লয়েড এসেছেন।

চলে যাবেন বিবেকানন্দ ভারতের দিকে।

বিদায়ের মুহূর্তে অশ্রু গড়িয়ে পরে নিবেদিতার।

লণ্ডনে এলেন নিবেদিতা।

নবীন ভারতের জ্ঞানের শিখার আলোয় জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সম্মেলনে তাঁর নতুন তথ্য প্রমাণ করলেন। তাঁর নামে প্যারিস মুখর। বিজ্ঞান-সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র গাছ-পালার মধ্যেও যে প্রাণ আছে তার প্রমাণ দিলেন।

আর তাঁরই আবিষ্কারের তথ্য নিয়ে জগদীশচন্দ্র এলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনে এসে নিবেদিতা দেখলেন জগদীশচন্দ্রকে। শুধু কি তাই? আপন করে নিলেন জগদীশচন্দ্রকে। কর্মতালিকায় নিবেদিতার কাজ বেড়ে গেল। এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র আপন সহোদরের মতই।

পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিকদের সভা বসেছে।

রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের তথ্য নিয়ে অনেক বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বাদ সাধলেন।

নিবেদিতা এগিয়ে এলেন এই সব বাধাকে দূর করে দেবার জন্য। রয়েল সোসাইটিতে যাবার আগে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হন। যার জন্য তাঁকে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হল।

নিবেদিতা আর অবলা বসু প্রাণপণে তাঁর সেবা করেছিলেন। সেবা আর প্রীতি দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে ভাল করে তুললেন।

জগদীশচন্দ্র দেখতে পেলেন, এক মমতাময়ী নারীকে। যার অন্তরে সারা বিশ্ব-জগতের কল্যাণ সাধনার স্বপ্ন……।

এখানে থাকার সময় নিবেদিতার লণ্ডনে দেখা হলো রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে। রমেশচন্দ্রের বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে নিবেদিতা এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহ পেয়ে নিবেদিতা ভারতীয় জীবনের রহস্য লিখতে শুরু করলেন।

নিবেদিতার পাণ্ডুলিপি দেখে রমেশচন্দ্র দত্ত বললেন : এত সুন্দর লেখা আপনার। তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করুন।

নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ওয়ে অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' লিখবার জন্য নরওয়ে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে এলেন লণ্ডনে। মন তাঁর তখন ভারতের দিকে।

হঠাৎ খবর এসেছে—লিখেছেন সারদা জননী 'চলে এসো' নরেন অসুস্থ।

সংবাদ পেয়ে আকুল হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। সারা অন্তর কেঁদে উঠলো। জাহাজে করে ফিরে গেলেন তাঁর স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেলুড়ে ফিরে এলেন নিবেদিতা। এসে দেখলেন, স্বামীজি অসুস্থ।

॥ আট ॥

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেলুড়মঠে ফিরে এলেন নিবেদিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে দেখলেন স্বামীজিকে নিবেদিতা।

তাঁর মনে হলো সেই বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষের যেন চলে যাবার ডাক এসেছে। নিবেদিতার চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। কিন্তু স্বামীজি নির্ভিক। ধ্যান গম্ভীর তিনি। দেখলেন বিবেকানন্দ তাঁর মানস-কন্যাকে। স্বামীজি যেন নিজেকে খুঁজে পেলেন।

ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আর তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতাকে দেখে সমবেত সন্ন্যাসীরা যেন নতুন করে প্রাণ খুঁজে পেলেন।

নিবেদিতা আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। গুরুর নির্দেশ শোনেন নিবেদিতা, 'সেবা কর, মানুষের সেবা কর'।

কলকাতায় এ সময়ে জাতীয় মহাসভার আসন্ন অনুষ্ঠানের জোয়ার লেগেছে। বেলুড়ে এসেছেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা; দেশ-প্রেমিক নেতারা। তাঁরা ছুটে এসেছেন বীর বিবেকানন্দের কাছে।

স্বামীজির কণ্ঠে মধুর বাণী—'মানুষ তৈরী কর'।

স্বামীজির প্রাণ-শক্তি, উৎসাহ আলোচনায় নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। অবিশ্রাম কথা বলার পর স্বামীজি যখন ক্লান্ত হতেন তখন নিবেদিতাই কথা বলতেন। নিবেদিতার মুখে কথা শুনে সমবেত নেতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

জাপান থেকে এসেছেন মিস ম্যাকলয়েড। এসেছেন প্রিন্স ওডা ওকাকুরা…।

জাপানে আসন্ন ধর্ম মহা-সম্মেলন।

স্বামীজিকে নিয়ে যাবার জন্য ওঁরা এসেছেন। স্বামীজি নতুন করে জেগে উঠলেন। উৎসাহ নিয়ে বৌদ্ধ-প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি যাত্রা শুরু করলেন বুদ্ধগয়ার দিকে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, শিল্পী ও কাকুরা এসে উঠেছিলেন সুরেন্দ্র নাথের কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি পরিচিত হলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথের সঙ্গে। সেই পরিচয়ে এলেন নিবেদিতা।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিপুন শিল্প-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ—

—কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা। ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর একটি প্রতিমূর্তি। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই?

অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন আরও, 'আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টিতে জাসটিস্ হিউমের বাড়িতে। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা পোশাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রূপালীতে মেশানো —উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে—যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্র উদয় হল।

সুরেন ঠাকুর ওকাকুরা, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ এদের এই আশ্চর্য যোগাযোগ ইতিহাসের পাতায় সজীব করে তুলেছেন।

বিপ্লবী মনের প্রেরণায়, দেশের শিল্প আর জাগরণের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে এলেন।

নিবেদিতা এবার স্বামীজিকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মায়াবতীর দিকে।

কিন্তু এখান থেকে ফিরে এসে স্বামীজির স্বাস্থ্য যেন আরও ভেঙে গেছে। সবাই চিন্তিত। কিন্তু স্বামীজি নির্ভয়। ধ্যানে বিলিন। মুক্তির প্রহর গুনছেন তিনি।

আর নিবেদিতা? গুরুর আশ-পাশে— মনে মনে প্রার্থনা।

একদিন বাগবাজারের বাড়ীতে দু'জন সাধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন বিবেকানন্দ। 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে' স্বামীজি এসেছেন। মেতে উঠলেন নিবেদিতা।

স্বামীজি বললেন, বাড়িটি ভালই। তোমার কাজের উপযোগী হয়েছে। কথাটা শুনে নিবেদিতা খুশী হলেন।

বিদায় নেবার আগে স্বামীজি বললেন, কাল সকালে বেলুড়ে এসো। তোমার কাজের বিষয় মঠের সাধুদের বলে দেব।

নিবেদিতা বললেন, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আমার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিনে আপনি আসবেন তো? আপনার আসা চাই যে।

গুরুর নির্দেশ মত নিবেদিতা বেলুড়ে গেলেন। ফিরে এলেন পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে। তাঁর অন্তরে আবার আলো। বিবেকানন্দময় তাঁর জীবন।

একদিন কী মনে কর নিবেদিতা এলেন বেলুড়ে।

খবর পেয়ে খুশী হলেন স্বামীজি।

নিবেদিতা দেখলেন, আনন্দময় স্বামীজি আজ যেন অন্য জগতে।

স্বামীজি তাঁর নিজের হাতে ঘটি থেকে জল দিলেন।

পরম যত্নে তাঁর মানস-কন্যাকে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য হলেন নিবেদিতা। বললেন: একি করছেন স্বামীজি? এ কাজ তো আপনার সাজে না?

স্বামীজি মধুর হাস্তে বললেন: কিন্তু মহামানব যিশু যে তাঁর শিষ্যদের নিজের হাতে পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদতিা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, কিন্তু শেষের দিনে। নিবেদিতা আর কিছু বলতে পারলেন না। চলে এলেন বেলুড় থেকে।

পরের দিন সকালে স্বামীজি নিবেদিতার কাছে একটা কেক পাঠালেন। গুরুর দেওয়া প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করে ধন্য হলেন নিবেদিতা। একটা অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাঁর মন চলে গেলো বেলুড় মঠে।

সকাল, দুপুর, বিকাল কাটল তাঁর ধ্যানে। সেদিন বিকালে ছাদে এসে নিবেদিতা ধ্যানের মধ্য দিয়ে গুরুকে দেখলেন। দেখলেন, যেন জীবনের এক পরম মুহূর্তে। দেখলেন নিজেকে, চিনলেন, জীবনের সত্যের পরম নিশানা।

ক্রমশঃ রাত হয়ে আসে। দেখতে দেখতে সময়ের চিন্তার ধ্যানের জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন তিনি।

কী পেলেন? কী দেখলেন তিনি?

দেখলেন পরম করুণাময় তাঁর জীবন-দাতা যেন তাঁকে ডাকছেন। আশ্চর্য!

শুনতে পান তাঁর দরজায় কে যেন আঘাত দিচ্ছে। নীচে নেমে গেলেন তিনি। একজন সাধু এসেছেন, হাতে তাঁর চিঠি।

চিঠি লিখেছেন সারদানন্দ : সব শেষ। স্বামীজি চলে গেছেন অমর-লোকে। কাল রাত ন'টায় স্বামীজি চির-নিদ্রায় ঢ'লে পড়েছেন। ৪ঠা জুলাই ১৯০২।

চিঠিটা তাঁর হাতে কাঁপছে। চোখের কোণে অশ্রুর বন্যা। স্থির থাকতে পারলেন না নিবেদিতা। চলে এলেন বেলুড়ে।

স্বামীজির দিকে তাকালেন। তাঁর ঘুমন্ত দেহের পাশে নিঃশব্দে বসে আছেন নিবেদিতা। শান্ত সমাহিত।

নিবেদিতার চোখে ভেসে ওঠে স্মৃতির মিছিল।

বীরসাধক চলে গেলেন মহাকালের ডাকে। স্বামীজির পবিত্র দেহ বাইরে শায়িত। ধীরে ধীরে নিবেদিতা উঠে এলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত দেখছেন নিবেদিতা।

স্বামীজির নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পবিত্র দেহ নামানো হয়।

চিতা সাজানো হ'ল। নিবেদিতাই প্রথমে অগ্নি সংযোগ করলেন। তারপর সাধুরা।

নিবেদিতা শান্ত। তাঁর মনে স্মৃতির মিছিল।

স্বামীজির কথা কানে আসে: 'মহাকালের ডাক শুনতে পেয়েছি। অমরনাথের ইচ্ছায় মৃত্যু বর পেয়েছি আমি।' চলে গেলেন গুরু।

ভাবমগ্ন নিবেদিতা। একটা গাছের তলায় বসে রইলেন। ক্লান্ত, শান্ত নিবেদিতা, মনে মনে প্রার্থনা, আমি যেন গুরুর কাজ করে যেতে পারি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। পাশে বসে স্বামী সদানন্দ। চোখের জলে প্লাবিত। কান্নার সাগরে ঢেউ ওঠে।

মনে মনে মুখরতা: এবার আমাকেই যেতে হবে পায়ে চলার পথে।

নিবেদিতা একবার আর এক জগতের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

স্বামীজির তিরোভাবের পর সম্পূর্ণ একা তিনি। বুঝলেন নিবেদিতা—এবার তাঁকে এগোতে হবে।

স্বামীজির আদর্শ আর চিন্তা তাঁর পথের পাথেয় হয়ে রইল। অন্তরে তাঁরই নাম, তাঁরই গান।

বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণমিশন। মিশনের উদ্দেশ্য মানুষের সেবা এবং তার মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চা ও তাকে মহান করে তোলা। দেশের রাজনীতি বা অন্য কোন সমস্যা বা চিন্তা তাদের নয়। নিবেদিতা এই সংঘেরই সেবিকা। তবুও মনের মধ্যে একটা বিপ্লবের শিখা নিয়ে তিনি নিজেকে সচেতন করলেন। মনের মধ্যে যে আলোড়ন, তারই তাগিদে নিবেদিতা একটি রূপে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

তাঁর কণ্ঠে, তাঁর গলায় সেই প্রতিধ্বনি।

নিবেদিতা নিজেকে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখলেন। আর সেই সূত্র ধরেই পরিচয় ঘটলো দেশ-প্রেমিক কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে। কলকাতায় জাতীয় জীবনের অধিবেশনে নিবেদিতা এগিয়ে

এলেন পরম উৎসাহে। বিদেশী শাসকের চোখে তাঁকে অন্য চোখে দেখা হল। ফলে তাঁর চিঠি, লেখা সমস্ত পুলিশের হস্তগত হলো।

কিন্তু নিবেদিতা নিশ্চিন্ত। তিনি তাঁর সংগ্রামে অটল। আরও গভীর ও ব্যাপক ভাবে তিনি নেতাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুললেন। এলেন গঙ্গাধর তিলক আর মহামতি গোখেল। নিবেদিতার কণ্ঠে জাগরণের অভয় বাণী। সংঘাত হলো মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

নিবেদিতার এই কর্ম-তালিকাকে বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাকে তাঁরা ভয়ের চোখে দেখলেন।

মিশন থেকে জানতে চেয়েছেন, কি তার পথ?

নিবেদিতার মনে তখন বিপ্লবের আগুন। জানালেন নিবেদিতা "আমার পথের সন্ধান আমি ঠিক করেছি। আমার কাজের জন্য আমিই দায়ী। রামকৃষ্ণ মিশনের কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন নিবেদিতা। পথ ভিন্ন হলেও হৃদয়ের বিকাশ রইল সেখানেই।

স্বামীজির তিরোভাবের পর তাঁর সামনে রইলো বিরাট কর্মময় জগত।

মনে পড়ে—স্বামীজি বলতেন: 'নিবেদিতা যদি মঠ ছেড়ে চলে যেতে চায়, ওকে বাধা দিও না। ওর পথ ও নিজেই চিনে নেবে।'

সেই পথের ডাক আবার ফিরে পেলেন নিবেদিতা। নিবেদিত আবার ভারত পর্যটনে বের হলেন।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন স্বামী সদানন্দ।

॥ নয় ॥

স্বামীজির তিরোভাবের পর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী সদানন্দকে নিয়ে নিবেদিতা তাঁর যাত্রা শুরু করলেন।

নিবেদিতা ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতের সর্বত্র হল তাঁর পথ চলা। দেখলেন, চিনলেন ভারতের মাটি ও তার পরিবেশ। বিচিত্র নরনারীদের দেখলেন। ভারত পর্যটনে তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে উঠল সংযোগ স্থাপন। ভারতের নরনারীদের চিনতে হবেই।

বোম্বাইতে এলেন নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে স্মরণ করে তাঁরই নামে মুখর হয়ে উঠলেন তিনি। নিবেদিতার কথা শুনে মুগ্ধ সবাই।

বোম্বে থেকে এলেন গুজরাট, আমেদাবাদ, আর লাহোর। অগণিত নরনারী বিস্ময়ে শুনলো নিবেদিতার কণ্ঠে ভারতের নারীর আদর্শ নিয়ে নতুন কথা। এই দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে নিবেদিতা সমস্ত ভারতবাসীর মন জয় করে নিলেন।

বরোদায় এসেছেন নিবেদিতা।

এইখানে এসে যে বিশাল হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল, তিনি হলেন ঋষি অরবিন্দ। তখন তিনি ছিলেন বরোদার রাজার শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ। ইংলণ্ড থেকে সবেমাত্র এসেছেন অরবিন্দ। নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তিনি। সেই সময়েই এলেন অগ্নিময়ী নিবেদিতা।

অরবিন্দ নিজেই নিয়ে এলেন স্বাগত করে নিবেদতাকে। পণ্ডিত-প্রবর রমেশ দত্ত ছিলেন এখানেই। তিনিও এলেন। নিবেদিতা, অরবিন্দ, রমেশ দত্ত তিনটি বিশাল হৃদয় মিলিত হলেন।

নিবেদিতা অরবিন্দকে দেখলেন, চিনলেন অরবিন্দকে। জ্বালিয়ে দিলেন প্রাণের আগুন। বললেন: এখানে আপনার স্থান নয়, বাংলা দেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

আসন্ন সংগ্রামের পটভূমিকায় নেপথ্য থেকে নির্দেশ আর তাকে প্রকাশ করবার জন্য চাই আলোর শিখা। সেই শিখারই আলো নিবেদিতা।

অরবিন্দ জানালেন প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাসের আলো নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। দেশকে জাগাবার মন্ত্র নিয়ে নিবেদিতা তাঁর কর্মসাগরে ডুবে গেলেন।

৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা ফিরে এলেন।

কর্ম-সাগরে ডুবে গেলেন তিনি।

বিদ্যালয়কে বড় করে তুলতে হবে। এই জন্য নিবেদিতা সচেষ্ট হলেন।

নিবেদিতার পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্রিস্টিন। ক্রিস্টিনের সাহায্যে বিদ্যালয় দ্রুত উন্নতির পথে এগোতে লাগল।

নিবেদিতা তাঁর কর্মতালিকা স্থির করলেন।

শ্রীমতী ক্রিস্টিন, শ্রীমতী সুধীরা বসুর সাহায্যে বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল।

মনে পড়ে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পূণ্য তিথিতে 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মরণ-তীথে জেগে ওঠে, সেদিনের কলকাতায় কোন বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের সতন্ত্র একটি বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যার নাম দেন 'ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন'। সেই সময়েই 'মহাকালী পাঠশালা' আর 'গৌরীমা'র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নিবেদিতা বলতেন, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মনের কতকগুলো ভাবের বিকাশ।" নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অবিশ্রাম পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর নিজের আয় থেকে তিনি বিদ্যালয় চালাতেন।

তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের রূপ দিলেন নানা ভাবে। অসামান্য প্রতিভায় বিকশিত হয়ে নিবেদিতা অনেক দূর এগিয়ে গেলেন।

এই বিদ্যালয়ের জন্য নিজের দিকে একবারও ফিরে তাকালেন

না। শুধু অফুরন্ত কাজের প্রেরণা নিয়ে সবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

বরোদা থেকে ফিরে আসার পর নিবেদিতা নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। দেশকে জাগাবার মন্ত্র গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রে।

নিবেদিতাকে নিয়ে তাঁর কর্মপ্রবাহ আর দেশ-প্রেমের প্রবল বন্যায় বাগবাজারের গৃহ মুখর তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। নিবেদিতার বাড়ীতে বৈঠক বসত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বুকে জেগে উঠেছে বিপ্লবের জোয়ার।

নিবেদিতার কাছে আসতেন বিপ্লবী আর ছাত্ররা। এলেন বারীন ঘোষ। মনে আগুন জ্বালিয়ে নিলেন। বললেন, তুমি আমাদের—জোয়ান অব আর্ক। তুমি আমাদের জাগাও।

সুরেন ঠাকুর আর সরলা দেবীও এলেন এই দলে।

নিবেদিতার কণ্ঠে জাগরণের-বাণী।

'ডন সমিতি'কে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে বিপ্লবের বন্যা শুরু হল। 'ডনসোসাইটিতে' যোগ দিলেন নিবেদিতা। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ডনপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন নিবেদিতা।

এখানে আসতেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি গুণীজনেরা।

বক্তৃতা দিতেন নিবেদিতা, বলতেন—দেশমাতৃকার সেবাই আমাদের কাম্য!

শুধু কি তাই? ভারতের বেদমন্ত্র আর তপস্যাকে নিয়ে তাঁর অন্তরে ভারত মুক্তির সাধনা। সংগ্রামের পটভূমিকায় তিনি অনন্যা।

নিবেদিতা লিখে চলেছেন জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁর রচনা। ইংরাজ-সরকার ভীত। কিন্তু তিনি নির্ভিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি-ওয়ে অব ইণ্ডিয়ান···লাইফ' লিখলেন। গুরুকে উৎসর্গ করা এই গ্রন্থে এশিয়াকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ মহাশয় নিবেদিতাকে দিয়ে লেখালেন তাঁর পত্রিকায়।

নিবেদিতার রচনাতে বাংলা চিনলো প্রেরণাময়ী বিপ্লবীকে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীতে লিখলেন নিবেদিতা,—রাজনীতি, শিক্ষা, আর শিল্পকলা নিয়ে।

দেশের জনসাধারণ জননেত্রীকে চিনলো নতুন করে।

নিবেদিতার রচনা 'নিউ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হত। এর সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

বরেণ্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন নিবেদিতাকে স্মরণ করে,—'ভগিনী নিবেদিতা সারা ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। 'নিবেদিতা নাম গ্রহণ তাঁর সার্থক। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনায় তিনি নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। ···ভারতের সাধনায় যে সব দিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইয়াছে, তাহাতে 'সত্য শিবই' তাঁর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে'।

একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিবেদিতা বুদ্ধগয়ার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে সাথী হলেন ক্রিস্ট্রীন, জগদীশচন্দ্র বসু, লেডি অবলা বসু, স্যার যদুনাথ সরকার। একটা বিরাট দল সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা যাত্রা শুরু করলেন। ইতিহাসের অনুরাগে তাঁর মন ভরে উঠেছে।

বুদ্ধগয়াতে এসে তাঁর চোখে ইতিহাসের পাতা ছায়া মেলে ধরলো। তিনি যেন দেখলেন, বুদ্ধদেব তাঁর জ্ঞান লাভ করেছেন এই বৃক্ষতলায়। সেই বৃক্ষতলে বসে নিবেদিতা খুঁজে পেলেন ফেলে-আসা অতীতকে।

বুদ্ধগয়া থেকে এলেন রাজগীর। এই রাজগীরে এসে হারানো ভারতীয় শিল্প সভ্যতাকে তিনি খুঁজে পেলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।

দীর্ঘকাল পরিশ্রমে নিবেদিতা হলেন শয্যাশায়ী। 'ব্রেন ফিবার' এসে নিবেদিতাকে আক্রমণ করল। সহ-কর্মী ক্রিস্টীনের আপ্রাণ

সেবা আর সারদা মায়ের আকুল প্রার্থনা, নিবেদিতাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে হবে।

জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতাকে নিয়ে গেলেন বাগবাজারের বাড়ী থেকে তাঁর কাছে। ডাঃ নীলরতন সরকার চিকিৎসা করলেন।

জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলা বসু সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা সেরে উঠলেন।

এর পর বসু-দম্পতীর সঙ্গে নিবেদিতা গেলেন দার্জিলিং-এ।

আচার্য বসু এই সময় তার 'উদ্ভিদ বিদ্যা' বই খানা লিখে প্রায় শেষ করে এনেছেন। কিন্তু শেষ হতে তখনো বাকী। পরম আগ্রহ নিয়ে নিবেদিতা তাঁর কাজকে রূপ দিলেন।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার পরিপূর্ণ চেষ্টায় 'উদ্ভিদের সাড়া' প্রকাশিত হয়।

ভগিনী নিবেদিতার এই অপরিসীম সাহায্যে আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের সাধনা সাফল্য লাভ করে। যা জগদীশচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অনন্য রূপে।

আকাশে বাতাসে জেগে উঠেছে বিচ্ছেদের সুর।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলা বিভক্ত করবার জন্য এক ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের খামখেয়ালীতে আইন পাশ করে বাংলাকে দু'ভাগ করা হল। মহামতি গোখেল ৬০ হাজার সই-যুক্ত প্রতিবাদলিপি পাঠালেন ভারত সরকারের কাছে। বিদেশীরা অটল।

নিবেদিতা তখন দার্জিলিং-এ। তাঁর অন্তরে জেগে উঠল বিদ্রোহের সুর। তখন দেশবন্ধু ও ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর নিবেদিতা দু'জনে দাঁড়ালেন জনতার সামনে। বিশাল জনতা।

নিবেদিতা বললেন: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। "এ দেশের প্রতিটি হৃদয়ে আজ এক শক্তি। যতদিন না বাংলার বুক থেকে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়, আমরা আমরণ সংগ্রাম করব।"

সারা বাংলা জেগে উঠলো।

বিশ্বকবির কণ্ঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখর।

আর নিবেদিতা?

যে মনের আগুন চাপা ছিল তাকে জ্বালিয়ে দিলেন কর্মসাগরে।

কাশীতে এলেন নিবেদিতা।

জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। গোখেল হলেন সভাপতি।

সকলের প্রতিনিধি হয়ে নিবেদিতা গেলেন মহামতি গোখেলকে আনতে। সমবেত জনতার জয়ধ্বনি। গোখেলের সামনে এগিয়ে এলেন নিবেদিতা।

জয়ধ্বনিতে মুখর সবাই। শোভাযাত্রার মিছিলে দেশনেতাকে বরণ করলেন শিখাময়ী নিবেদিতা। 'বন্দেমাতরম' সংগীতে সভা উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ। গোখেলের ভাষণ শুনে জনতা স্তব্ধ।

তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, রমেশ দত্ত এলেন এই সভায়।

কিন্তু নিবেদিতা এই সভায় আসতেন না। নেপথ্য থেকে তিনি এই শক্তির প্রেরণা দিতেন। এই সভার প্রতিটি নেতা সন্ধ্যাবেলায় আসতেন নিবেদিতার কাছে।

নিবেদিতা সকলের হয়ে মতামত ও ভাষণ ঠিক করে দিতেন। তারপর সেই সব বিবরণ লিখে পাঠাতেন কলকাতার স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে। সেবা আর কাজের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে এলেন তাঁর কর্ম-সাগরে।

॥ দশ ॥

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে, লোকমাতা নিবেদিতার বিস্ময়কর জীবনের পটভূমিকায় তাঁর একান্ত নীরবে দেশের কাজ ও সেবার মহানব্রত।

তাই একদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রসঙ্গে বলেছেন: "শিবের প্রতি সতীর সত্যকারের প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে

অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল, তিনি অনেক দিন অর্ধাশন ও অনশন স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সেখানে বাতাসের অভাবে ও গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবুও ডাক্তার বা বন্ধু বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই। এবং আশৈশব তাঁর সমস্ত সংস্কার ও আশ্বাসকে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন। ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহার মোহ ছিল না; সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর কৈলাসের শিবকেই যিনি স্বামীরূপে লাভ করিতে চান, তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"

লোকমাতা নিবেদিতার মনের গভীরতায় ছিল জ্ঞান বিকাশের উজ্জ্বল আলোর নিশানা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার অন্তরের প্রকৃত রূপের সন্ধান পেয়েই পরবর্তীকালে লিখেছিলেন: "ভগিনী নিবেদিতাকে দেখেছি তিনি লোক সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন,—শুধুমাত্র তাঁহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্যা মুসলমানী রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে; কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়াও তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।"

লোকমাতা নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় ভারতের মাটিতে একদিন

যে নতুন আলোর শিখা জেগেছিল, আজকের স্বাধীন ভাবতে তা আমাদের মনে জাগে। পরাধীনতার মর্মবেদনায় তাঁর অন্তর কেঁদে উঠেছিল সংগোপনে। তাই তাঁর বাণীতে ও কাজে বিপ্লবের জোয়ার বয়েছিল একদা ভারতের বুকে…

মনে পড়ে, যখন লণ্ডনে স্বামীজি দেখেছিলেন নিবেদিতাকে,—নিবেদিতা ছিলেন তখন এলিজাবেথ মার্গারেট নোবেল। স্বামীজি দেখেই বুঝেছিলেন যে মার্গারেটের মধ্যে রয়েছে বিরাট প্রাণ বিরাট কাজের সম্ভাবনা।

তাই স্বামীজি একদা বলেছিলেন "তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরও অনেক আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম…। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে...তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস। আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে? এর চেয়ে মহত্ত্ব কোন্ কাজ আছে?

স্বামীজির এই কথার মধ্য দিয়েই মার্গারেট জেগে উঠলেন। সেদিন তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের হাজার হাজার নরনারী তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

স্বামীজি একদিন বলেছিলেন: পশ্চিমের একটি নারী যদি আজ ভারতের মাটিতে আসে, যদি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে পথ দেখিয়ে দেয়! সেই পথের আলো নিয়ে এলেন নিবেদিতা।

মনে পড়ে মার্গারেট যেদিন প্রথম সারদা জননীর পাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন, সেদিন সবার মা সারদা স্নেহে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, —তুমি এসেছ মা, আমার ভারী আনন্দ হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে মায়ের কাছে মেয়ে পেলেন স্নেহরসধারার বিভা, আর বিকশিত হলেন বিদেশিনী মার্গারেট—নিবেদিত হলেন নিবেদিতায়।

স্মরণতীর্থে জেগে ওঠে; কামারহাটিতে গোপালের মাকে নৌকা করে দেখা করতে গেছেন নিবেদিতা, সঙ্গে দু'জন বিদেশিনী মহিলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাধন্যা অঘোরমণি, গোপালের মা, নিবেদিতা আর দু'জন বিদেশিনীকে তুলে নিলেন বুকে। পরম স্নেহভরে তাদের আশীর্বাদ জানিয়ে নিজের হাতে খেতে দিলেন মুড়ি আর নারকেল। আর নিবেদিতা ও তার সঙ্গিনীরা পরম আগ্রহে তাই খেলেন…।

সেবা জীবনের পরমধর্ম। এই মহান পুণ্যব্রত নিয়েই নিবেদিতা তাঁর চলার পথ শুরু করেছিলেন।

স্মরণ-তীর্থপথে জেগে ওঠে, কলকাতার ভীষণ প্লেগের ছায়া; আকাশে, বাতাসে কান্নার রোল।

স্বামীজি তখন ছিলেন দার্জিলিং-এ। ছুটে এলেন বীর বিবেকানন্দ।

স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, দরকার হলে নতুন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রি করে দেব। আমরা ফকির, মুষ্টি ভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রয় করে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচে, তবে কিসের জায়গা—কিসের জমি?

বীর বিবেকানন্দের এই বাণীতে ছুটে এলেন গুরু ভাইয়েরা। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সেবকরাও সেবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করলেন…। স্বামীজির নির্দেশে নিবেদিতা হ'লেন এই সেবা কার্যের সভাপতি ও সম্পাদক। স্বামী সদানন্দ ছিলেন প্রধান পরিচালক।

মূর্তিময়ী সেবা নিবেদিতাও স্বামীজির পাশে দাঁড়ালেন। দুঃস্থ অসহায় প্লেগাক্রান্ত নরনারীদের মনে দিলেন আশা। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাংলার নরনারীরা দেখলেন এক অপরূপ কল্যাণীকে। নিবেদিতা নিজের নামে বিকশিত হয়ে নিজের নাম স্বার্থক করলেন।

এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার পরবর্তী কালে লিখেছিলেন: প্লেগের সময় কলকাতায় কী আতঙ্ক… কলকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড়ু ও

কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে নেমেছেন···পরে শুনলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডন হ'তে এনেছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম শিক্ষা আমরা ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ্য করেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

পরবর্তী কালে বুদ্ধগয়া দর্শনে নিবেদিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নিবেদিতা ছিলেন এক শক্তিময়ী নারীর পুর্ণ বিকাশ।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে যাওয়ার পদধ্বনিতে আমরা দেখেছি নিবেদিতাকে নানারূপে। কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। দ্বৈত মনের এই স্বপ্নাবরণে নিবেদিতার 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছিলেন ;—যখন আমরা নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাত্রা করলাম তখন বেলা শেষ হয়ে গেছে এবং বনপথ অতিক্রম করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল। আমরা রাস্তা ধরে বরাবর চলতে লাগলাম, রাস্তায় কোথাও খুব উঁচু, কোথাও আবার বিশাল ক্রমরাজী ছায়া বহুল ····যতক্ষণ বেলা ছিল, আমরা গোলাপ বন এবং ঝরনার আশ-পাশে সরু সরু পাতাওয়ালা এক জাতীয় ফারন্ এবং দাড়িম্বের লাল লাল ঝুড়িগুলো দেখতে দেখতে চলেছিলাম···।

'স্বামীজির সহিত হিমালয়' নিবেদিতার অমর গ্রন্থ। এই ভ্রমণ কালে নিবেদিতা দেখছিলেন প্রকৃতির অপরূপ রূপ, আর পেয়েছিলেন ভারতের আকাশ আর মাটির বিচিত্র স্বাদ।

মনে পড়ে, দ্বিতীয়বার যখন স্বামীজির সঙ্গে নিবে'দতা প্রথমে আমেরিকা গিয়েছিলেন—স্বামীজি কথা প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে বলেছিলেন : ভাবুকতা ছেড়ে নিজেকে জানো। নিজেকে যখন জানতে পারবে, তখন তুমি আকাশ হতে বজ্রের মত ভেঙ্গে পড়বে দুনিয়ার উপরে। যারা বলে আমার কথা কি কেউ শুনবে, তাদের উপর

আমার কোন আস্থা নেই। কিন্তু বলবার মত পুঁজি যার আছে, তার কথাটা শুনে ফিরিয়ে দিতে দুনিয়া এ পর্যন্ত পারেনি। নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ করতে পারবে? পারবে তুমি? যদি না পার ত' হিমালয়ের শিখরে গিয়ে শিখে এস।"

স্বামীজির এই কথায় নিবেদিতা জেগে উঠলেন পরম তৃপ্তির চেতনায়।

প্রসঙ্গত আরও দৃষ্টান্ত আমাদের মনে আসছে। স্বামীজিই তাঁকে এক সময়ে বলেছিলেন, "মনে রেখো ভারত চিরকালই ঘোষণা করেছে—আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়; প্রকৃতিই আত্মার জন্য।"

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে নিবিড় ভাবে নিবেদিতা জড়িয়ে পড়লেন। নিজেকে উৎসর্গ করলেন ভারত মাতার চরণে।

ভগিনী নিবেদিতার গৃহ মুখর হয়ে উঠল। এলেন বিপ্লবীরা, এলেন দেশ-নেতারা, সেই সঙ্গে সঙ্গে আসতেন বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট মনীষীরা।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বিপিনচন্দ্র পালের পৌরোহিত্যে টাউন হলে বাংলাকে ভাগ করে দেবার প্রতিবাদে নিবেদিতার তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা।

নিবেদিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল দেশপ্রেমের গান। তিনি নারী-সমাজকে আহ্বান করে বললেন, "দেশের প্রত্যেকটি পুরুষের সবচেয়ে বড় ও প্রধান কর্তব্য বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, নারী জাগরণেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইবে, নতুন প্রভাত জাগিবে, আমি দিগন্তে তাহারই আভাস দেখিতে পাইতেছি।"

নিবেদিতারই এই কথায় জেগে উঠল সারা ভারতের নতুন প্রাণ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি—'শ্রীঅরবিন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরী নিবেদিতা সম্বন্ধে যাহা বলেছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "অরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর

প্রথমে আর্য পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, ডন সোসাইটিতে ছিল তাহার বীজ। এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একটা প্রেরণা ইহাতে ছিল এবং প্রেরণা আসিয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে। শ্রীঅরবিন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা ডন সোসাইটির তরুণ যুবক দলের মধ্য দিয়া নূতন জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক রাজনীতি বিদ্যুৎ প্রবাহের মত প্রচার করেছিলেন প্রচুর।"

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রসঙ্গে তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পুস্তকে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালবেসে ছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবার উপরে। বাগবাজারের ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালকে কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন…… কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। ও কাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন…। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগ্‌রা, গলায় ছোট ছোট…সে যে কী দেখলুম… কি করে বোঝাই!"

বিপ্লবের পথ ধরে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন নিবেদিতা।

স্বামীজির চিঠি ছিল তাঁর নিত্যপাঠের সাথী!

"যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন তবে যেমন ভাবে আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনি ভাবে তোমাকেও যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যান…।"

স্বামীজির তিরোভাবের পর নিবেদিতা ডুবে গেলেন বিরাট কর্মসাগরে। তবুও নিবেদিতা সব সময় ভাবতেন, স্বামীজি যেন তাঁর পাশে পাশে রয়েছেন। গুরুর সেই চিরসত্য বাণী তাঁর হৃদয়ে বেদমন্ত্রের মতই দেখা দিত।

মনে আছে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'

যখন উদ্বোধন হয়, তখন আবেগঘন ভাষায় জগদীশচন্দ্র বলেছেন : 'আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনে এই মহিয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথকে একবার জগদীশচন্দ্র এক পত্রে লিখেছিলেন : শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতারই আশ্রয় লইতাম। বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধকের এই স্বীকৃতি নিবেদিতার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধার উপহার।

স্বামীজি বলেছেন নিবেদিতাকে ; তুমি ক্ষত্রিয়াণী। মনে রেখো আমরা এক গোত্রের লোক। তুমি ব্রাহ্মণ নও ; কৃচ্ছ, তপ তোমার নয়! কাজ কর, লড়ে যাও। আর যে কোন অবস্থায় তুমি মনে রাখবে তুমি স্বাধীন…। অন্তরের প্রেরণাকে গভীরভাবে অনুভব কর, তারপর আর কিছুই তোয়াক্কা করিনা। মনে রেখো তুমি মায়েরই দাসী। তিনি যদি তোমায় কিছু না দেন, কৃতার্থ হয়ে ভেবো, তোমায় তিনি কি মুক্তি দিয়েছেন ?…

স্বামীজির অগ্নিময়ী বাণীই ছিল নিবেদিতার ধ্যান ও জ্ঞান…। অসামান্য নারীর আলোর বিকাশে জেগে উঠল পরাধীন ভারত আশা আর আলোর প্রেরণায়।

তাই নিবেদিতা নিজেই বলতেন ; আমি বিশ্বাস করি ভারত এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকৃতি আর এক সম্প্রীতি হইতেই জাতীয় একতার উদ্ভব হয়। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাহার খেলা, বিদ্বানের বিদ্যায় এবং ধর্মের ধ্যানে যাহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি সেই শক্তিই আজ আমাদের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম আজ —জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান ভারতের মূল রহিয়াছে প্রাচীন ভারতের গভীরে। সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভাবীকাল। যে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান যে মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও, আমাকে তোমার করিয়া দাও।"

নিবেদিতার মনের আয়নার ছায়া ফেলেছিল পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রী

সারদামণির আদর্শ আর বাণী। জননী সারদার পাদপদ্মে বসে শুনতেন ভারতের প্রাচীন নারীর নানাপ্রকার অমর গাথা। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রের অতুলনীয় বিকাশ দেখেছেন—জননী সারদার চরিত্রের ভিতর প্রাচীন ও নবীন ভারতের আদর্শ…।

তাঁর 'The master as I saw him' গ্রন্থে শ্রী মা সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন: আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ বাণী…। কিন্তু তিনি কি একটা পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি! না নূতন কোনো আদর্শের অগ্রদূত। তাঁর ভেতরে আমরা খুঁজে পাই সেই জ্ঞান বা মাধুর্য যা সাধারণতম নারীর অনায়াসলভ্য……তাঁর সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা একটানা নারীর প্রার্থনার মতো।"

নিবেদিতার অন্তরে জাগরিত ছিল মায়ের নাম জ্ঞান, মনে পড়ে আমেরিকা থেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে বুলের আত্মার শান্তির জন্য জননী সারদাকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন—তাতে দেখা গেছে জননী সারদার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরম বিস্ময়।

নিবেদিতা যাহা লিখেছিলেন তাঁর কিছু অংশ পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি।

'আদরিণী মা, সারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ খুব ভোরে আমি গির্জায় গিয়াছিলাম। সবাই ওখানে বিশ্বজননী মেরীর কথা চিন্তা করছেন। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা. তোমার সেই মনোরম মুখখানি। সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনের সাদা শাড়ি। আমার মনে হয়, তোমার এই ভাবসত্তাই যেন বেচারী সারার রোগে নিয়ে আসবে শান্তি…।…মাগো! ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার

মতো উত্তেজনা বা উগ্রতা··· । তোমার ভালবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণ ধর্ম···।

এগিয়ে চলে কাল। সময় স্মৃতিকে বহন করে ভারতীয় নারীর চির-আশার আলোর বাণী নিয়ে নিবেদিতা এগুলেন। জীবন ও সত্য সাধনার বিচিত্র গতিতে স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

॥ এগার ॥

স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করলেন পরিপূর্ণ ভাবে। নিবেদিতা আলো জ্বালিয়ে দিলেন সকলের অন্তরে।

বিপুল শক্তিতে তিনি জয় করে নিলেন দেশের নেতাদের, ছাত্রদের আর নিপীড়িত ভারতের প্রতিটি মানুষকে।

সবাই তাঁর পতাকাতলে পেয়েছে পরম বিশ্বাসের বাণী।

বারীন ঘোষ আর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দু'জন মিলে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন— যার নাম 'যুগান্তর'।

নিবেদিতার লেখনিতে জোয়ার বইল। অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাতেও লিখলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা তরুণদের হাতে তুলে ধরলেন জাগরণের ইতিহাস।

তাঁর জীবনালোকে দেখা গেছে পরাধীনতার মর্মবেদনা। তাই তাঁর অন্তর কেঁদে উঠত বার বার। তিনি দেখেছিলেন এই ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারীতে, দৈন্যে, দুঃখে, রোগে, শোকে জর্জরিত।

অবসাদ আর ক্লান্তিতে নিবেদিতার মন ভরে গেছে।

মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে গুরুর ডাক।

তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে নানা স্মৃতি! জীবনে কি পেলাম, কি দিলাম?

বিলিয়ে দেব আমার যা আছে।

নিঃশেষ করে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন তিনি।

উইলে সব লেখা রইল। ক্রিস্টিনকে দিলেন বইয়ের সমস্ত আয়। আর আচার্য বসুকে দিলেন তাঁর বিজ্ঞানচর্চার জন্য নিজের অর্জিত তিন হাজার পাউণ্ড।

জীবন দর্শনের অপূর্ব ইতিহাস। তাঁর অমর সৃষ্টি, ব্যথা-বেদনায়, চোখের জলে লেখা, "দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম" স্বামীজির সম্বন্ধে যা বুঝেছেন তারই ওপর লেখা গ্রন্থ। জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, পরম বিস্ময়ে লেখা এই গ্রন্থ নিবেদিতার জীবন দিয়ে লেখা।

এগিয়ে চলে কাল।

বাংলার ও ভারতের মাটিতে বিদ্রোহের আগুন।

ছুটে এলেন নিবেদিতা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিরাট যজ্ঞে।

লাজপত রায় দ্বীপান্তরে—বিপিন পান বন্দী।

নিবেদিতার বাড়ীতে বিপ্লবীদের মন্ত্রণা সভা।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল বাংলার আকাশে ও বাতাসে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতা এলেন লণ্ডনে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে। মিসেস বুল, ম্যাকলয়েডকেও দেখলেন নিবেদিতা। দেখলেন চেনা-শুনা মা, ভাই বোন।

মা মেরী দেখলেন সন্ন্যাসিনী নিবেদিতাকে। ভারতের মাটি, ধূলা, মাটির প্রদীপ, গঙ্গাজল পেয়ে মা মেরী অবাক হয়ে যান।

ইংলণ্ড থেকে গেলেন ইউরোপে। মিলিত হলেন আচার্য জগদীশ বসুর সঙ্গে। আচার্য জগদীশ বসুকে পেয়ে নিবেদিতা খুশী হলেন।

তারপর এলেন আয়ারল্যাণ্ডে।

এলেন ভাইয়ের কাছে। ছেলেবেলার মার্গারেটকে তাঁর মনে হল, এখান থেকেই তাঁর দেশ-প্রেমের মন্ত্র পাওয়া।

আমেরিকায় গেলেন। এলেন ইংলণ্ডে।

হঠাৎ টেলিগ্রাফ পেলেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

মা মেরী মৃত্যু শয্যায়। ছুটে এলেন নিবেদিতা। 'মাগো এসেছি।'

মেরীর চলে যাবার সময় উপস্থিত।

মায়ের পাশে মেয়ে। চলে গেলেন মা। স্মৃতি আর কান্না।

তারপর···২রা জুলাই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মা, ভাই-বোনকে ছেড়ে ভারতের পত্রে যাত্রা করলেন নিবেদিতা।

এলেন ভারতের পথে। দীর্ঘ দু'বছর পরে।'

কলকাতায় এসে দেখলেন সব যেন বদলে গেছে। রাজনৈতিক পটভূমিকার রঙ্গমঞ্চ বদলে গেছে। বারীন ঘোষ আর উল্লাস কর দত্তের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ তখন কারাগারে। বিপ্লবীরা ছন্নছাড়া।

শ্রীঅরবিন্দ জেল থেকে ফিরে এলেন।

নিবেদিতা দেখলেন। দেখলেন যেন আরেক রূপে।

বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ এলেন আরেক রূপে। রাজনীতি আর ধর্ম চর্চা-কে গ্রহণ করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পথের সন্ধান খুঁজে পেলেন।

প্রকাশ করলেন কর্ম-জীবন আর ধর্ম। সহযোগীতায় রইলেন নিবেদিতা।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে নতুন সুর, নতুন চিন্তার জাল।

ভারত সরকার শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠাবেন, এই খবর পেয়ে নিবেদিতা তাঁকে বললেন : ভারত ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

শ্রীঅরবিন্দ চলে গেলেন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে।

যাবার সময় নির্দেশ দিয়ে গেলেন নিবেদিতার ওপর কাজ চালাবার।

দেখা হল না···শ্রীঅরবিন্দের বাকী কাজ করতে শুরু করলেন নিবেদিতা। কিন্তু এই কাজে যেন তিনি আর উৎসাহ পেলেন না।

তাঁর মনে হলো, এবার চলে যেতে হবে তাঁকে।

গুরুর নির্দেশ নিয়ে অবিশ্রাম কর্ম সাগরে ডুবে গেলেন নিবেদিতা।

ধ্যানময় ভারতের তীর্থ পথে আবার নিবেদিতা যাত্রা সুরু করলেন।

আঘাতের পর আঘাত আসে।

আজীবন সঙ্গী সদানন্দ স্বামী চলে গেলেন অমরলোকে।

তীর্থযাত্রায় বের হলেন নিবেদিতা অন্তরের জ্বালা নিয়ে।

তাঁর মনে হচ্ছে যেন সব কিছু হারালেন তিনি।

হিমালয় মহাতীর্থে কেদারনাথ আর বদ্রীনারায়ণ। জগদীশচন্দ্র বসু অবলা বসুর সঙ্গে যাত্রা করলেন এই পূণ্যতীর্থ পথে।

শুরু হল তীর্থযাত্রা। এলেন হরিদ্বার। তারপর শুভ তীর্থ যাত্রার পথে। মনে মনে প্রার্থনা, কখন দর্শন মিলবে দুর্গম কেদারনাথের? নিবেদিতার মনে অশান্ত বেদনা। নিবেদিতা চলেছেন পরম তীর্থে। চলেছেন আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পথ অতিক্রম করে।

পরমতীর্থ কেদারনাথ।

ত্রিনয়ন মহাদেবের পাদপদ্মে নিবেদিতা ধ্যানমগ্না।

'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে।

নিবেদিতার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল···।

কেদারনাথের পর এলেন বদ্রীনারায়ণের পথে—পরম করুণাময় বিষ্ণুর চরণ তলে।

শেষ হ'ল তীর্থযাত্রা। ফিরে এলেন কলকাতায়।

আমেরিকা থেকে টেলিগ্রাফ পেলেন নিবেদিতা। 'মিসেস বুল মৃত্যু অপেক্ষায়: একবার দেখা চাই, শেষ দেখা। আকুল হয়ে ছুটে গেলেন নিবেদিতা। যাত্রা করলেন শেষ বারের মত।

মৃত্যুশয্যায় বুল। বুলের মেয়ে ওলিয়াও এলেন। নিবেদিতাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। ভাবলেন—ভারত থেকে ছুটে এসেছে নিবেদিতা, অর্থের লোভেই। অপমান করল নিবেদিতাকে।

কিন্তু নীরব নিবেদিতা।

মিসেস বুল চিরতরে চলে গেলেন।

নিবেদিতা ফিরে এলেন গভীর ব্যথা নিয়ে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে খবর পেলেন—ওলিয়া মামলায় হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বুলের সমস্ত অর্থ ভারতের জন্য দিয়ে গেছেন।

আঘাত আর আঘাত।

চলে গেছেন স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী।

শেষ সময়ে নিবেদিতা ছিলেন তার পাশে পাশে।

চলে গেলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

চলে গেলেন স্বামী সদানন্দ।

নিবেদিতা বুঝলেন এবার বুঝি চলে যাবার ডাক এসেছে।

বিষাদমগ্ন নিবেদিতা। ধ্যানমগ্না তিনি।

শুধু নীরব প্রার্থনা ; গুরু আমার নিয়ে চলো······

দার্জিলিং-এ এলেন নিবেদিতা। সঙ্গে আচার্য বসু পরিবার।

এখানে এসে নিবেদিতা খুশী হলেন। তাঁর মনে হল, তুষার ঘেরা পাহাড় তাঁকে ডাকছে।

যাত্রা শুরু হল। তিব্বতের সন্দুক মন্দিরের প্রবল আকর্ষণে শান্ত।

মহাকাল হাসে। নিষ্ঠুর নিয়তির করাল গ্রাসে নিবেদিতার জ্বর এল। ভীষণ জ্বর, একটানা দীর্ঘ তের দিন।

জীবনের ডাক এলো।

বৈরাগ্যের বেশে আজ নিবেদিতা শান্তির তীর্থে এগোচ্ছেন।

অমৃতলোকের পথে তাঁর যাত্রা। মঠ থেকে গণেন মহারাজ দেখেন।

অবলা বসুর কাতর প্রার্থনা।

আচার্য বসুর নিদ্রাহীন চোখে অপলক দৃষ্টিতে সেবা আর সাধনা।

মৃত্যুর পথে, ক্লান্তির পথে চলে যাচ্ছেন নিবেদিতা।

ধ্যানে স্থির, সত্য তিনি।

অন্ধকার থেকে আলোক, অসত্য থেকে সত্যের পথে ভারত কন্যা নিবেদিতা তাঁর গুরুর নাম স্মরণ করছেন······

নীরব। নিথর। সাড়া নেই। বেদমন্ত্রের মত মৌনতায় মুখর নিবেদিতা।

কী যেন বলতে চাইলেন -

কেঁদে উঠলেন সমবেত বন্ধুরা। অবলা বসু ডুকরে উঠলেন। গণেন মহারাজ স্তব্ধ। জগদীশ বসু নীরব।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ বাণী : তরী ডুবছে, তরী ডুবছে······আবার দেখব নতুন সূর্যোদয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর নিবেদিতা চলে গেলেন অমরলোকে।

মনে পড়ে লোকমাতা নিবেদিতার তিরোভাবের পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; "নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা"। এই মাতৃভাব, পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, সেই মূর্তিকে আমরা ইতিপূর্বে কল্পনাও করি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্য আছে, তাহার কিছু আভাষ পাইয়াছি। কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মানববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই।······ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে সত্যই ভালবাসিয়াছেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে······তাহার মত নিকটে আসিবার শক্তি আমরা তো লাভ করি নাই।"

নিবেদিতা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর কাজ আর বাণী। সেই পথে যেন এগোতে পারি আমরা।